ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ।। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৭ জুন, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার দায় এড়াচ্ছেন রেলমন্ত্রী ও রাজ্য সরকার

।। **গূঢ়পুরুষ**।। মাওবাদী উপদ্রুত পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এলাকায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় অসংখ্য সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক নিষ্ঠুর প্রাণহানি ঘটেছে। চিরকালের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন তারও বেশি ট্রেন যাত্রী। স্বজনহারা মানুষের বিলাপ রেলমন্ত্রী মমতাকে (তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় পদবি বর্জন করেছেন) কতটা বিচলিত করেছে জানা নেই। কারণ, তৃণমূল নেত্রী এই দুর্ঘটনার জন্য রাজনৈতিক নাশকতাকে দায়ী করেছেন।

তাঁর বক্তব্য, তাঁকে পছন্দ করে না এমন একটি রাজনৈতিক দল পুরসভার ভোটে তৃণমূলকে হারাতে রীতিমত ষড়যন্ত্র করেই মুম্বাইগামী জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসকে লাইনচ্যুত করেছে। কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের রাজনীতিক এবং দায়িত্ববান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এমন আজব কথা বলতে পারেন তার দ্বিতীয় কোনও নজির নেই। মমতা বোধহয় ভুলে গেছেন যে তিনি রেলমন্ত্রী হওয়ার পর সারা ভারতে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১২৩টি রেল দুর্ঘটনা হয়েছে। সে সব দুর্ঘটনাই কী তাঁকে যারা পছন্দ করে না তারা ষড়যন্ত্র করেই ঘটিয়েছে বলে তিনি মনে করেন? রেলমন্ত্রীর কি উচিৎ নয় যে তাঁর মন্ত্রীত্বের এক বছরে রেল দুর্ঘটনার সংখ্যা, কারণ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্পর্কে একটি শ্বেতপত্র সংসদে পেশ করা? প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের দুর্নীতি নিয়ে যদি তিনি সংসদে তড়িঘড়ি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে পারেন তবে নিজের ব্যর্থতার খতিয়ান প্রকাশে তাঁর তো দ্বিধা থাকার কথা নয়। মা, মাটি, মানুষের প্রবক্তার কাছে দেশের মানুষ জানতে চায় ভারতীয় রেলে সফর কতটা নিরাপদ। রেলমন্ত্রীকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে সে কথা জানাতেই হবে। অপরকে দোষারোপ করে নিজের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যে যায় না সে কথা তাঁকে বুঝতে হবে।

মমতাপন্থী বিদ্বজ্জনেরা বলছেন ষড়যন্ত্র করে নাশকতা চালিয়ে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটালে তার দায় রেলমন্ত্রী নেবেন কেন? ভাল কথা। তবে উত্তরবঙ্গের গাইসালে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার পর মমতা তদানীন্তন রেলমন্ত্রী নীতিশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেছিলেন কেন? তা'ছাড়া যদি নাশকতার জন্যই জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনায় পড়ে থাকে তবে রেলের এফ আই আরে সে' কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকার প্রয়োজন ছিল। ষড়যন্ত্র করে ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটানোর ফৌজদারি ধারায় মামলা দায়ের করা উচিত ছিল রেলের। কে বা কারা ষড়যন্ত্র করেছিল তা অবশ্যই তদন্তের বিষয়। কিন্তু রেল লাইনে বিস্ফোরণের ফলে ট্রেন লাইনচ্যুত হয় শুধু এইটুকু অভিযোগ করলেই এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনাকে লঘু করে দেখানো হয় না কি?

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারও সমান দায়ী। এই রাজ্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুম্বাইগামী রেলপথের অনেকটাই মাওবাদী উপদ্রুত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় পড়ে। বিশেষত যে সব এলাকায় এখন যৌথ বাহিনীর অভিযান চলছে সেখানে মাওবাদী ঘাতক বাহিনী নাশকতা চালাতে পারে সে কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর জানা আছে। এই ঘাতকরা সাধারণভাবে রেল ও সড়ক পথের যাত্রীদেরই টার্গেট করে থাকে। তাই মাওবাদী উপদ্রুত এলাকায় দিবারাত্রি নজরদারির প্রয়োজন আছে। এই দায়িত্ব রাজ্য পুলিশ যে পালন করে না তা স্থানীয় মানুষের জানা থাকলেও মহাকরণের ঠান্ডা ঘরে বসা মন্ত্রী আমলারা তার খবর রাখেন না। রাখলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপারকে জবাবদিহি করতে হোত। শিলদায় ই এফ আর জওয়ানদের হত্যার ঘটনার পর রাজবাঁধে (সরডিহা স্টেশনের কাছে) জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই জেলা পুলিশের চরম গাফিলতি প্রকাশ পেয়েছে। তারপরেও বুদ্ধবাবুরা দায়ী অফিসার কর্মীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন এমন কথা জানা নেই। একটা কথা ভুললে চলবে না যে রেলপথকে নিরাপদ রাখার প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের। বুদ্ধবাবু ও তাঁর দলের নেতারা প্রকাশ্যেই বলেছেন মাওবাদীরাই রেল দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। তা যদি সত্য হয় তবে মাওবাদী এলাকায় নাশকতা দমনে রেল ও সড়ক পথে রাত্রে টহলদারী বন্ধ থাকে কেন? যৌথবাহিনীর অভিযান চলছে এবং নাশকতাও চলছে এ' কেমন কথা? কেউ জানে না যৌথবাহিনীর অভিযানের সাফল্য কতটা? রেলমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরও উচিৎ শ্বেতপত্র প্রকাশ করে প্রকৃত তথ্য দেশবাসীকে জানানো। দয়া করে দায় এড়ানোর নোংরা রাজনীতি করবেন না। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা বন্ধ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাজেট

অরিন্দম মুখার্জী।। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ২০১০-১১ আর্থিক বছরের বাজেট-টি রাজ্যের সংখ্যালঘু তোষণের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল—এ কথা বলাটা বোধহয় ভুল হবে না। এবারের বাজেটটি দেখলে সকলেরই বহু ব্যবহৃত বাংলা প্রবাদ—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'-এর কথা মনে হবে। প্রচলিত প্রবাদটি এ ক্ষেত্রে অল্প বদল করলে বোধ হয় আরও বেশী যুৎসই হবে—মুসলমানদের জন্য লাগে টাকা দেবে বাম সরকার।

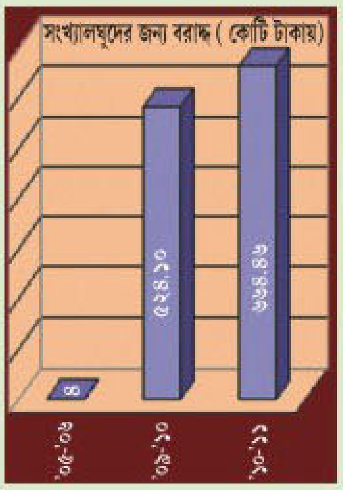

২০০৫-০৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের বরাদ্দ ছিল ৪ কোটি টাকা। গত বছরে (২০০৯-১০) সেই বরাদ্দ দাঁড়ায় ৫২৪.১০ কোটি টাকায়। এ বছর তা পৌঁছেছে ৬৬৪.৪৬ কোটি টাকায়। অর্থাৎ গত বছরের থেকে এবছরের বরাদ্দ বেড়েছে ১৪০.৩৬ কোটি টাকা। সামগ্রিক বরাদ্দের পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়বরাদ্দ যথাক্রমে ৩০০ কোটি ও ৩৬৪.৪৬ কোটি টাকা। এখানে উল্লেখ্য ২০১০-১১ আর্থিক বছরে পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ১৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা এক কথায় নজিরবিহীন।

রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এই দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আব্দুস সাত্তার। এবারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বাজেট ভাষণ আব্দুস সাত্তারই রেখেছেন। এই দপ্তরটি নামেই সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর, অনায়াসেই এই দপ্তরের নাম পাল্টে মুসলমান বিষয়ক দপ্তর রাখা যেতে পারে। কারণ এবারের বাজেটে কোথাও মুসলমান বাদে রাজ্যের অন্যান্য ধর্মীয় ও ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কোনও প্রকল্প ঘোষিত হয়নি। এবার মুসলমানদের জন্য রাজ্যসরকারের দান-খয়রাতের জাবদা খাতার মূল বিন্দুগুলিতে চোখ বোলান যাক।

'রাজ্য সরকারের নিরবচ্ছিন্ন অবেক্ষণ ও প্রণোদনায়' রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যেখানে রাজ্যের মুসলমানদের ৮.৬৯ শতাংশ ঋণ প্রদান করেছিল সেখানে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেই ঋণ

(এরপর ৪ পাতায়)

কেদার-বদ্রীনাথ রেলপথ

স্বপ্নের প্রকল্প রূপায়ণের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সীমান্তের ওপারে চীন যখন কুইনঘাই-তিব্বত রেলপথ তৈরি করে ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলতে তৈরি হচ্ছে, তখন ভারতও আর বসে থাকতে পারছে না। হিমালয়ের দোরগোড়া ঋষিকেশ থেকে কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত নতুন রেল-লাইন পাতা হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই রেলপথকে কর্ণপ্রয়াগ থেকে একেবারে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে মানা গ্রাম পর্যন্ত। যেখান থেকে ভারত-চীন সীমান্ত মাত্র ৪০ কিলোমিটার। ইতিমধ্যেই রেলমন্ত্রক ২০১০-১১ আর্থিক বছরে এই পর্যায়ের জন্য ৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। পুরো প্রকল্পটির জন্য মোট অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে ৪২৯৫.৩০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, মানা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩১৫০ মিটার উঁচু।

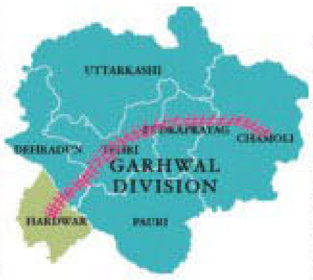

বহু প্রতীক্ষিত ঋষিকেশ-কর্ণপ্রয়াগ রেলপথ প্রকল্পটি জাতীয় প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর রেলমন্ত্রক অর্থ বরাদ্দ করেছে। ক্যাবিনেট কমিটি অফ ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স (সি সি ই এ)-এর মাধ্যমে এই বরাদ্দ কৃত অর্থ ব্যয় হবে। সংসদের গত বাজেট অধিবেশনেই এই মর্মে ঘোষণা করা হয়েছিল। লাভজনক হবে না বলে ইতিপূর্বে রেলওয়ে বোর্ড এই প্রকল্প বাতিল করে দেয়।

উল্লেখ্য, ঋষিকেশ-কর্ণপ্রয়াগ রেলপথ তৈরির প্রথম সমীক্ষা হয় ১৯১৯ সালে তদানীন্তন গাড়োয়ালের ডেপুটি কমিশনার জে এম ক্লে-এর তত্ত্বাবধানে। পরে ১৯৯৬ এবং ২০০৯-এ এই প্রকল্পটি নিয়ে সমীক্ষা হলেও অলাভজনক বলে রেল বোর্ড তা বাতিল করে দেয়। পরে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটির কৌশলগত গুরুত্ব ও আর্থ-সামাজিক উন্নতির কথা ভেবে এই রেলপথটিকে জাতীয় প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করে। আশা করা হচ্ছে, ২০১৯ সালের মধ্যে পুরো প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে।

ঋষিকেশ থেকে কর্ণপ্রয়াগ রেলপথের মাধ্যমে যুক্ত হলে একটি স্বপ্নের প্রকল্প বাস্তবে রূপ নেবে। হিমালয়ের কোল থেকে একেবারে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সরাসরি রেলপথের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে। গত শতকের প্রথম পাদে বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনেত্রী—গাড়োয়াল হিমালয়ের এই চার ধামে শুধু পার্বতারোহীরাই যেতে পারতেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটিশরা মোটরগাড়ী যাওয়ার রাস্তা তৈরি করেছিল। ১৯৩৪ সালে এই রাস্তা তীর্থযাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া

(এরপর ৪ পাতায়)

পাকিস্তানে থাকতে নারাজ ৯৮ শতাংশ কাশ্মীরী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-এর ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত যে সেইসময় ভুল ছিল না তার প্রমাণ মিলল এই সময়। লন্ডন কেন্দ্রিক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক চাথাম হাউসের পক্ষ থেকে একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের মাত্র দুই শতাংশ অধিবাসীরা চান পাকিস্তানে যোগ দিতে। বাকি আঠানব্বই শতাংশ-ই ভারতে থাকার পক্ষপাতী। এই সমীক্ষার ফলে পাকিস্তান এতদিন যে কাশ্মীরে গণভোট নেবার দাবি জানাচ্ছিল, তাও ঠুনকো হয়ে গেল বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সমীক্ষাটি জম্মু-কাশ্মীর এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অধিবাসীদের ওপর চালানো হয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষই বলেছেন যে তাঁরা ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চান। একমাত্র শ্রীনগর আর বুদগাম জেলা বাদে আর কোথাও পাকিস্তানপন্থীরা ঠাঁই পায়নি। লন্ডনের কিংস কলেজের স্কলার ও এই সমীক্ষার সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত রবার্ট ব্র্যাডনক জানিয়েছেন, তাঁরা কাশ্মীরের উভয় অংশে (অর্থাৎ ভারতে থাকা

(এরপর ৪ পাতায়)

সমীক্ষার ফলাফল

প্রশ্ন। সন্ত্রাস দিয়ে কি কাশ্মীর সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব?

	না	হ্যাঁ	যথাপূর্বং তথা পরং
সব মিলিয়ে	৩৬%	২৪%	৩৪%
জম্মু-কাশ্মীর	৩৯%	২০%	৩৬%
পাক-অধিকৃত কাশ্মীর	৩১%	৩৭%	৩০%

প্রশ্ন। ভারত-পাক নিয়ন্ত্রণ সীমারেখাকে স্থায়ী সীমারেখা হিসেবে মেনে নিতে আপনি কি প্রস্তুত?

হ্যাঁ	না	সংজ্ঞা পাল্টানো হোক
৫৮%	৮%	২৭%

প্রশ্ন। সন্ত্রাস দিয়ে কি কাশ্মীর সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব?

	স্বাধীনতা	ভারতে যোগদান	পাকিস্তানে যোগদান
সব মিলিয়ে	৪৩%	২১%	১৫%
জম্মু-কাশ্মীর	৪৩%	২৮%	২%
পাক-অধিকৃত কাশ্মীর	৪৪%	১৯%	৫০%

অরুণাচলকে খৃস্টান করার জন্য জঙ্গি মদতে চার্চও সক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মণিপুরকে অশান্ত রণক্ষেত্র বানানোর পর নাগাল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড (কেননা নেতৃদ্বয় আইজাক ও মুইভা হল্যাণ্ডের আমস্টারর্ডামেই বসবাস করেন) ভিত্তিক উগ্রপন্থী সংগঠন এন এস সি এন (আই এম) এবার অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলাকে খৃস্টানীকরণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। গ্রামবাসীরাই এই লজ্জাজনক অভিযোগ এনেছেন। ওই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হয় বৌদ্ধ নয়তো প্রকৃতিপূজক। দীর্ঘকাল ধরে অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং এবং তিরাপ জেলা নাগাল্যাণ্ডের শক্তিশালী জঙ্গি গোষ্ঠী এন এস সি এন (আই-এম) এবং এন এস সি এন (খাপলাং) গোষ্ঠীর সন্ত্রাসবাদীদের কাছে স্বর্গতুল্য নিরাপদ এলাকা বলেই বিবেচিত হয়ে আসছে।

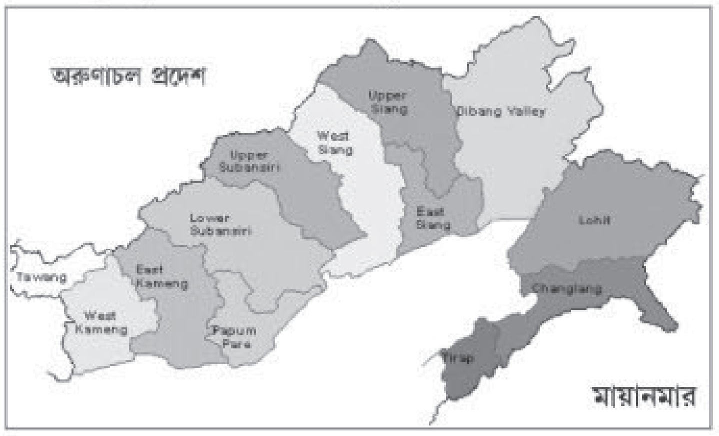

দেরীতে পাওয়া এক খবরে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এন এস সি এন (আই-এম) জঙ্গিরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বন্দুকের মুখে সাতদিনের মধ্যে খৃস্টান হওয়ার ফরমান জারি করেছে। একথা জানিয়েছেন, জয়রামপুর শহরের নিকটবর্তী লংমান গ্রামের জনৈক বৌদ্ধ ও জনজাতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। অন্য একজন গ্রামবাসী বলেছেন, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম এবং অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা এবং কার্বি আংলং জেলাকে নিয়ে একটি খৃস্টান এলাকা কায়েম করার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। অরুণাচল প্রদেশের বৌদ্ধ ও স্বধর্মনিষ্ঠ জনজাতিদের পক্ষে ইন্ডিজেনাস ফেথ ও কালচারাল সোসাইটি অফ্ অরুণাচল বৌদ্ধ টিখাক এবং প্রকৃতি-পূজকদের বলপ্রয়োগে জোরজবরদস্তিতে খৃস্টানীকরণ বন্ধ করতে আবেদন জানিয়েছেন। টিখাকরা চাংলাং জেলার এক বৌদ্ধ জনজাতি গোষ্ঠী। উপরোক্ত সমিতি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে এবিষয়ে সতর্ক ও বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেছে। সমিতির বক্তব্য সরকারকেই মূল অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইন্ডিজেনাস ফেথ অ্যান্ড কালচার‍্যাল সোসাইটি অফ্ অরুণাচল প্রদেশ (IFCSAP) ছাড়াও, পূর্বাঞ্চল ভিক্ষু সঙ্ঘ, বৌদ্ধ টিখাক সম্প্রদায়ও এন এস সি এন (আই-এম) জঙ্গিদের সাহায্যে জোরজবরদস্তি খৃস্টান মতে ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চাংলাং জেলার অবস্থান মায়ানমার ও নাগাল্যাণ্ডের সীমান্তে।

অনেক স্বধর্মনিষ্ঠ জনজাতি নেতাদের মতে এই বলপ্রয়োগে ধর্মান্তকরণ 'বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ড' গঠনের পরিকল্পনারই এক অবিভাজ্য চক্রান্ত বা অঙ্গবিশেষ। দীর্ঘদিন ধরে NSCN(IM) জঙ্গিরা অরুণাচল, অসম, মণিপুর এবং নাগাল্যাণ্ডের নাগা বসতিযুক্ত অঞ্চলকে সংযুক্ত বা একীকরণের দাবী তুলে আসছে। ৯০-এর দশকে NSCN(IM) কেন্দ্রের সঙ্গে অস্ত্রবিরতি চুক্তি করার পর থেকেই তিরাপ ও চাংলাং জেলায় খৃস্টমতে ধর্মান্তরকরণের বিভীষিকা উগ্ররূপ ধারণ করেছে। সূত্রমতে, এন এস সি এন (খাপলাং) জঙ্গি গোষ্ঠীটিও ধর্মান্তরকরণে খৃস্টান ধর্মযাজকদের সহায়তা করার ফরমান সেই নব্বই এর দশক ও একবিংশ শতকের (২০০১) প্রথমেই জারি করেছিল। যা এখনও বর্তমান এবং তা নিয়ে নতুন করে প্রয়াসও শুরু হয়েছে। তখন থেকেই বিভিন্ন স্বধর্মনিষ্ঠ জনজাতি গোষ্ঠী, বৌদ্ধ সংগঠন এবং ছাত্র সংগঠন এই অসাধু ঘৃণ্য চক্রান্ত তথা ষড়যন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। অপরপক্ষে চিরাচরিত প্রথামতো (NSCN(IM) এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে অস্বীকার করেছে। ঘটনার সত্যতা কিন্তু রয়েইছে। কেন না চাংলাং বৌদ্ধ নেতারা ইতিমধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছেন। আর তা যে বাস্তব একথা অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই। বিস্তীর্ণ উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে চার্চ ও জঙ্গিদলের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, যোগাযোগ-বোঝাপড়াটা ওয়াকিবহাল মহল উড়িয়ে দিতে চান না। ত্রিপুরার এন এল এফ টি-এর এক বড় উদাহরণ।

এই সময়

ট্র্যাডিশন অপরিবর্তিত

জগদীশ চন্দ্র বসুর সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। যে মর্মান্তিক ট্র্যাডিশনের পরিণতি হিসেবে জগদীশ বসুর রেডিও আবিষ্কারের চিরকালীন কৃতিত্বটা নিজের স্কন্ধে তুলে ফেলেছিলেন মার্কনি। সেই ট্র্যাডিশনের পদধ্বনি-ই এখন শুনতে পাচ্ছেন চান্দ্রায়ন-১-এর ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। ৩৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নাসার পক্ষ থেকে যে 'লুনার মিশন'-এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তাতে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বিজ্ঞানীদের 'সাইডলাইন' করার চেষ্টা করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। এমনটাই অভিযোগ ভারতীয় বিজ্ঞানীদের। প্রসঙ্গত, চাঁদে জল আবিষ্কারের কৃতিত্ব চান্দ্রায়ন-১ নামক চন্দ্রগামী মহাকাশযানটির। আর তাতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদানই ছিল সর্বাধিক। যুগ পাল্টালেও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জগতের মানসিকতার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

নিষিদ্ধ ফেসবুক

পাকিস্তানের পর এবার বাংলাদেশ। সেদেশেও নিষিদ্ধ হলো জনপ্রিয় সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ফেসবুক। এহেন নিষিদ্ধ-করণের সম্ভাব্য কারণ—প্রথমত, ফেসবুকে বাংলাদেশের নেতা-নেত্রীদের নিয়ে সাম্প্রতিকতম কিছু বিরূপ মন্তব্য এবং দ্বিতীয়ত, পয়গম্বর মহম্মদকে ক্যারিকেচার করা। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হলো—এই নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে সেদেশের বুদ্ধিজীবীমহল মোটেই সরব হয়নি। ভারতে এরকম কিছু ঘটলে, মানে হিন্দু দেব-দেবীদের অপমান করা হলে যদি এদেশের সরকার (সেটা বিজেপি পরিচালিত হওয়াই স্বাভাবিক) তা বাজেয়াপ্ত করতো, তাহলে এতক্ষণে তুলকালাম লেগে যেত। কিন্তু ধন্য আশা কুহকিনী, এর বিপরীতটা কোনওদিনও হওয়া সম্ভব নয়, অন্তত এই 'সেকুলারিজিমে'র রাজত্বে! শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী, লাহোর হাইকোর্ট ফেসবুকের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে পাক-সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। ঢাকা হাইকোর্ট কি করবে?

নিউটনের তৃতীয় সূত্র

অপমান করার জন্য যে এত ছল-চাতুরীর প্রয়োজন হয়, তা কানাডীয় ভিসা কাণ্ডের পূর্বে জানা ছিল না কারুর। সম্প্রতি অটোয়া (কানাডার রাজধানী) বলেছে, তাদের দেশে যদি ভারতীয়রা আসতে চান তবে কানাডা সরকারের কাছে 'গোপনীয় তথ্য' (সিক্রেট ডিটেলস) জমা করতে হবে। 'গোপনীয় তথ্য' মানে ধরুন সেনাবাহিনীর লোক হলে আপনাকে জানাতে হবে—আপনি সেনাবাহিনীর কোন ইউনিটে আছেন, সেখানে আপনার ভূমিকা কি, আপনার বসের নাম কি, কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে; এছাড়া আরো স্পর্শকাতর কত কী যে আপনাকে জানাতে হবে! কানাডা সরকারের এহেন ন্যক্কারজনক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে দেশের কূটনীতিক মহল। তাদের এই সিদ্ধান্ত দেশবাসীকে অপমানিত তো করেছেই, উপরন্তু পাকিস্তান আর চীনকে সমরাঙ্গণেও তা সহযোগিতা করতে পারে। কানাডা কি ভুলে গেছে নিউটনের তৃতীয় সূত্র—প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

ভোটের পূর্বে

২০১০ পুরসভা ভোটের প্রাক-মুহূর্তে দু'টি ঘটনা ঘটেছে। প্রথমত, সরডিহাতে ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রায় দেড়শো মানুষের মৃত্যু। যার পেছনে মাওবাদীদেরই হাত রয়েছে বলে রাজ্য সরকারের বক্তব্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমান। দ্বিতীয় ঘটনা হলো—স্ট্র্যাণ্ড রোডে ওয়্যার-হাউস ভেঙ্গে তিনজনের মৃত্যু। প্রথম ঘটনায় লাভবান সিপিএম। দ্বিতীয়টায় তৃণমূল। সিপিএম পন্থীরা (ওনারা অবশ্য বললেন নিরপেক্ষ) জ্বাললেন মোমবাতি, মমতাপন্থীরা করলেন প্রেস কনফারেন্স; নিউজ চ্যানেলওয়ালারা হাসিমুখে উপহার দিয়ে গেলেন এই ডান-বাম তরজা। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল জনতা। কিন্তু যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের কথা ভাবল না কেউ, শুধু মৃতদের আত্মীয়রা ছাড়া। কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষমাস।

ক্রিকেট-মশকরা

শেষ ল্যাপে এয়ারটেলকে পেছনে ফেলে ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্পনসরশিপ দৌড়ে জিতে গেল সাহারা। নতুন চুক্তি অনুযায়ী প্রতি ম্যাচ পিছু ৩.৩৪ কোটি টাকা বি সি সি আই-কে দেবে তারা। মজার ব্যাপার হলো, এই প্রদেয় অর্থ টেস্ট ম্যাচ হোক কিংবা ওয়ান ডে অথবা টি-টোয়েন্টি সব ক'টি ধরনের ম্যাচের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ পাঁচদিনের টেস্ট ম্যাচ হলে যেমন ভারতীয় ক্রিকেট দলকে ৩.৩৪ কোটি টাকা দেবে স্পনসর সাহারা, আবার সাড়ে তিন ঘন্টার টি-টোয়েন্টির জন্যও সমমূল্যের অর্থ-প্রদান। ভাবা যায়! পাঁচদিনে যা রোজগার, মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টাতেও তাই রোজগার! আসলে ক্রিকেটীয় স্কিল (প্রতিভা) বিনোদন (নিন্দুকেরা বলছেন উচ্ছৃঙ্খলতা)-এর নিকট পরাস্ত হয়েছে।

বর্ষার পদধ্বনি

কারা কারা যেন গত বছর রটাচ্ছিল যে ২০০৯ সালটাই নাকি পৃথিবীর উষ্ণতম মরসুম (গত চার দশকের মধ্যে) ছিল। ২০১০-এর দিকে তাকালে এটা কেউ বিশ্বাস করবে? যুক্তি দেখাতে পারেন, বিশ্ব উষ্ণায়ণের ভরা বাজারে উষ্ণ মরসুমের রেকর্ড আসলে ক্ষণভঙ্গুর, কারণ প্রতি বছরই গরমের দাপটে নিত্য-নতুন রেকর্ড হবে এখন থেকে। প্রখর তপন তাপে এই যুক্তি যতই নির্মম শোনাক, অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে বঙ্গবাসীকে স্বস্তি দিতে বর্ষা আসছে। ইতিমধ্যেই তার আগমনীবার্তা ঘোষিত হয়েছে কেরলে। সাধারণত কেরলে আসার সাতদিনের মধ্যেই মৌসুমী বায়ু এ রাজ্যে ঢুকে যায়। আবহবিদরা বলছেন, বঙ্গোপসাগর উপকূলে একটা জটিলতা তৈরি হয়েছে। সেটা কেটে গেলে ঠিক সময়েই আসবে বর্ষা। বাঁচবে বাঙালী!

হাইডেল পাওয়ার কথাবার্তা

সিন্ধুপ্রদেশের কমিশনারদের বৈঠকে ভারত-পাক চুক্তির প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই উঠে এল। মূলত, ইউ আর আই-দুই এবং ছুটাক হাউডেল পাওয়ার প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। প্রসঙ্গত, এই দুটি প্রকল্পই কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে। জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকে চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বিষয়টা হচ্ছে যে চুক্তি হওয়া খুব ভাল ব্যাপার কিন্তু তা একতরফা হলেই একটা একটা আশঙ্কা থেকে যায়। ইতিপূর্বে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যে ক'টি সামাজিক চুক্তি হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার খেসারত দিতে হয়েছে ভারতকে। আর এবার চুক্তির অকুস্থল যেখানে জম্মু-কাশ্মীর, তখন তার খেসারতের একটা নিদারুণ সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জনগণনায় জাত গণনা কেন ?

এইবারের জনগণনার সবচেয়ে বিতর্কিত এবং ভয়াবহ দিক হইল জাতপাত ভিত্তিক জনগণনা। মহান ভারতীয় জাতি কেন এক সংকীর্ণ জাতগণনায় রত হইল ? এই প্রশ্নে আজ বুদ্ধি জীবী মহল বিভক্ত। একদিকে সরকারি আনুকূল্যে প্রতিপালিত একদল বুদ্ধি জীবী যাহারা সরকারি মদতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলির খোঁয়াড়ে জাবর কাটে আর অপরদিকে রহিয়াছে বিপুল সংখ্যক জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রেমী বুদ্ধি জীবী যাহারা সমস্তরকম সরকারী প্রতিকূলতার মধ্যেও সদা স্বদেশের কল্যাণে ব্রতী।

প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধি জীবীগণ যাহারা রাজনৈতিক দল ও সরকারি ও বেসরকারি আনুকূল্যপ্রাপ্ত গণমাধ্যমগুলিতে দুধেভাতে পালিত এবং স্বদেশ ও রাষ্ট্রের হিতের অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের দিকেই বেশী সচেতন, তাহারাই দাবী করিতেছে জাত গণনার। এই ধরনের দলীয় নেতাগণের জীবিকা জাতপাতের রাজনীতির উপর নির্ভরশীল। জাতপাতের ফেরিওয়ালারাই এই ধরনের বিপজ্জনক দাবী করিতেছে। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য এই জাতভিত্তিক গণনার ফল লইয়া তাহারা অধিক অধিক সংরক্ষণের দাবী করিতে পারিবে—কী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কী চাকুরী ক্ষেত্রে, কী নির্বাচনী আসন বন্টনের ক্ষেত্রে! ইহাই হইল তাহাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা। কিন্তু মুখে বলিতেছেন তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল এস সি/এস টি/ও বি সি পরিসংখ্যান সংগ্রহ। ঘটনা হইল Anthropological Survey ইতিমধ্যেই এই পরিসংখ্যানগত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাতে ৬৫,০০০ জাতের হিসাব আছে। ভারত সরকারের নিকটও রহিয়াছে ও বি সি-র অন্তর্ভুক্ত ৬০০০ জাত ও উপ-জাতের তালিকা। রাজ্যে-রাজ্যে রহিয়াছে বিভিন্ন ও বি সি তালিকা। ইহা ছাড়া রহিয়াছে তপশিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত কেন্দ্রীয় পঞ্জিকৃত ১৮৮৫টি জাতের তালিকা। তাহা হইলে আবার জাতীয় জনগণনার মধ্যে এই জাতের তালিকা প্রস্তুতির কি প্রয়োজন ? গতবারের জনগণনার সময়ে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভিত্তিক হ্রাস-বৃদ্ধি র গণনা করায় জনগণনা কমিশনারের বাপান্ত করিয়াছিল এই ধান্দাবাজ বুদ্ধি জীবীরাই। মুসলিম সংখ্যাবৃদ্ধি বিপজ্জনক পর্যায়ে চলিয়া যাওয়ায় ইহারা তাহা চাপা দিতেই যেন বেশী আগ্রহী। কিন্তু এইবার সেই সেকুলারবাদীগণ নীরব কেন ?

নীরব যে সকলেই আছে তাহা কিন্তু নয়, কংগ্রেস দলের মধ্যেও চাপান-উতোর আছে। মন্ত্রীমণ্ডলীও বিভক্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, তাহার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই জাতভিত্তিক গণনার বিপদ ও অসুবিধা দুই-ই ব্যক্ত করিয়াছে। অজয় মাকেনের মতো তরুণ স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী তো সকল সাংসদদের নিকট প্রতিবাদ পত্রও পাঠাইয়া দিয়াছে। আইনমন্ত্রী বীরাপ্পা মইলিও উল্টা গাওনা গাইয়াছেন। দলের অন্তরাত্মা সঙ্গে সঙ্গে তাহার নন্দী-ভৃঙ্গীদের পাঠাইয়া থাকেন ও মইলিকে ধমকাইয়া দিয়াছেন যাহাতে তাহারা তাহার রাজনৈতিক গেমপ্ল্যানে বাধা হইয়া না দাঁড়ান। তাহাদের কাছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের চেয়ে রাজ্যপাটই বেশী দরকার, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ চুলোয় যাক। তিনি কি জানেন না যে বৃটিশ জমানায় ১৯৩১ সালের গণনায় শেষবারের মতো এই জাতগণনা করা হইয়াছিল। এই অন্তরাত্মার দলের জাতীয় নেতাগণই সেদিন এই জাতভিত্তিক গণনার তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহাদের মতে সেদিন এই জাতভিত্তিক গণনা ছিল জাতিকে বিভক্ত করিবার এক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। সেই জাতীয় নেতাগণ আজ আর জীবিত নাই, থাকিলে তাঁহারা দেখিতেন আজ জাতিকে বিভক্ত করিবার চক্রান্ত করিতেছে তাহাদেরই জাতীয় দল কংগ্রেস। এই কংগ্রেস দলই আজ একের পর এক এই ধরনের বিভেদকামী কাজের মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করিতেছে। এই সেদিন কংগ্রেস দলের বিহার প্রদেশের কার্যালয় আধিকারীদের নির্বাচন করা হইয়াছে জাতের ভিত্তিতে। সাচার কমিটি, মণ্ডল কমিটি, রঙ্গনাথ কমিটি—সবই জাতিকে বিভক্ত করিবার এক একটি পদক্ষেপ।

আশার কথা কিছুদিন আগে নয়া দিল্লীতে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক একদল বুদ্ধি জীবী "মেরি জাতি হিন্দুস্থানী" নাম দিয়া একটি সংগঠন গঠন করিয়া আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছে। জনগণের কাছে তাহাদের আহ্বান—জনগণনাকারীদের কাছে নিজ জাত নথিভুক্ত করিবেন না। তাহাদের কাছে নিজ জাত হিসাবে "হিন্দুস্থানী" কথাটি লিপিবদ্ধ করান। যেমন অমিতাভ বচ্চন সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে তাহার কোনও জাত নাই—তিনি হিন্দুস্থানী—এটিই তাহার জাতীয় পরিচয়।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

নিজ ইতিহাস সম্পর্কে যথার্থ বোধ না থাকায় পরিপূর্ণ স্বদেশ চেতনাও থাকে না, তাই দেশ সেবার আকুলতাও জাগে না। স্বদেশকে মুখ্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত্ব না করিবার একটা দোষ এই যে স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জঙ্গলমহলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সকলেই জানেন যে, যৌথবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে এক ধৃত গ্রামবাসীকে আদালতে তোলার দাবিতে গত ২৫ এপ্রিল জঙ্গলমহলের তিনটে জেলায় বনধ্ ডেকেছিল 'পুলিশী সন্ত্রাস-বিরোধী জনসাধারণের কমিটি।' এই কমিটি আগেই জানিয়েছিল—তল্লাশি অভিযানের নামে যৌথবাহিনী অবিরত অত্যাচার চালিয়ে থাকে নিরীহ মানুষদের ওপর—সম্প্রতি গোয়ালতোড়ে তিনজন মহিলাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে, নিহত হয়েছে একজন গ্রামবাসী, মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কয়েকজন। তাছাড়া ২০-২৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হলেও তাঁদের কাউকে আদালতে তোলা হয়নি।

কমিটির নেতাদের মতে, এই ধরনের অত্যাচার চলছে দীর্ঘদিন ধরে। তাই মাঝে মাঝে বনধ্ ডেকে এবং অন্যভাবেও সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদ জানাতে হচ্ছে।

অবশ্য যথারীতি পুলিশ কর্তারা এই সব অভিযোগকে ডাহা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ-সুপার মনোজ ভার্মা বলেছেন—পূর্বোক্ত কমিটির নেতাদের এই সব কথার কোনও ভিত্তিই নেই। যাঁদের ধরা হয়েছে, তাঁরা সবাই মাওবাদী এবং তাঁদের নিয়ম অনুসারেই আদালতে পাঠানো হয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন উঠবে—আমরা যাঁরা সাধারণ মানুষ, আমরা কার কথা বিশ্বাস করব ?

অবশ্যই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়—পুলিশের কোনও কথাকে বিশ্বাস করার মতো কারণ আমরা খুঁজে পাইনি। ইতিমধ্যেই আমাদের জানা হয়ে গেছে যে, আমাদের আমলাতন্ত্র ও পুলিশীযন্ত্রটা চলে শাসকদলের কথায়। এদের আচার-আচরণে মনে হয়—এরা সরকারের চাকরি করে না, করে শাসকদের গোলামী। পদোন্নতি, পোস্টিং, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধের প্রাপ্তি মেনে প্রায় সব অফিসার ও কর্মীদের মেরুদণ্ডকে এমন করে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যে, আইনের শাসনের বলে রাজ্যটাই হয়ে উঠেছে একটা নৈরাজ্যের প্রতীক। তবে এই দাস-মনোভাবটাও এতটা ক্ষতিকারক হতো না;যদি প্রভুরা একটু সেবা, কল্যাণ আদর্শ, মানবিকতাবোধ ও সুস্থ চিন্তা নিয়ে চলতেন। তা না হলে, ওপরমহলের ভ্রান্ত ও অসুস্থ নীতিকে মস্তিষ্কহীন অধস্তনরা কার্যকর করতে গিয়ে রাজ্যটাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাদের পেছনে ক্যাডাররা থাকায় অবস্থা আরও বিশ্রী হয়ে গেছে।

জঙ্গলমহলে কি হতে পারে, সেটা আমাদের পক্ষে অনুমান করাটা আদৌ কঠিন কাজ নয়। মনে পড়ে চল্লিশ বছর আগের সাঁইবাড়ি ঘটনার কথা? কর্তব্যে যার এত বড় গাফিলতি হয়েছিল, সেই জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পরে প্রমোশন পেয়ে মুখ্যসচিব হয়েছিল। আর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলাটা সরকার বে-আইনীভাবে তুলে নিয়েছে—ফলে তাদের কেউ মন্ত্রী, কেউ সাংসদ, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পদাধিকারীও হয়েছে (তবে 'ভারতরত্ন' বা 'পদ্মবিভূষণ' ধরনের কোনও খেতাব এখনও দেওয়া যায়নি)! পুলিশ এত বছর ধরে কি করেছে এই ব্যাপারে? মনীষা মুখার্জী, ভিখারী পাশোয়ান কোথায়?

বিজন-সেতুর সেই নারকীয় ঘটনাটাও মনে পড়ছে। সতেরো জন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে পুড়িয়ে-খুঁচিয়ে-থেঁতলে মেরে ফেলা হয়েছিল 'ছেলেধরা' অপবাদ দিয়ে। কিন্তু না—আমাদের এপারে সব হত্যাই অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না।

বানতলায় কয়েকজন মহিলা সমাজকর্মীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল, নিহত হয়েছিলেন গাড়ির ড্রাইভার। এক নিহত মহিলাকে হত্যা করা হয়েছিল পৈশাচিক উল্লাসে—পরে তাঁকে পাটভাঙা শাড়ি ও নতুন ব্লাউজ পরানো হয়েছিল। কিন্তু পোস্টমর্টেমের সময় তাঁর ক্ষত-বিক্ষত যৌনাঙ্গ দেখে লেডি-ডাক্তার নাকি মূর্ছিত হয়েছিলেন।

কিন্তু এক্ষেত্রেও পুলিশ-প্রশাসন ছিল নির্বিকার-নিরাসক্ত হয়ে। অপরাধীরা ধরা পড়েনি আজও।

মরিচঝাঁপিতে পুলিশ ও ক্যাডারের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন ৩৬ জন উদ্বাস্তু। অনাহারে মারা গিয়েছিলেন ১৬৬ জন। চারদিক অবরুদ্ধ করে ও জলে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার ফলে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ২৩৯ জন। ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন ২৩ জন অসহায় নারী। নিখোঁজ হয়েছেন ১২৮ জন।

এঁরা কারা? এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ঘটেছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে? কার্ল মার্ক্সের কোন্ বইয়ের কত নং পৃষ্ঠায় এই ধরনের মহান বিপ্লবের কথা শেখানো হয়েছে?

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরও রয়েছে কেশপুর, ছোট আঙারিয়া, সুচপুর, ধানতলা ইত্যাদির নারকীয় কাহিনী। অশ্রু ও রক্তে বহু জায়গার মাটি ভিজেছে—হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নিপীড়ন অবাধে চলেছে দিকে দিকে। বাইক-বাহিনী সদম্ভে ও সশস্ত্রভাবে এলাকা দখল করেছে—আর হাজার হাজার মানুষ প্রাণভয়ে আশ্রয়-শিবিরের দিকে ছুটেছেন। তাঁদের একমাত্র অপরাধ হলো—তাঁরা শাসকদলে নাম লেখাননি।

ডি. এম., এস. পি., ও. সি-রা তখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে গেছে এই বীভৎসতার দৃশ্য। উপায় নেই—তারা মস্তিষ্ক ও মস্তক বাঁধা দিয়েছে প্রভুদের পায়ে, মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিয়ে চাকরি নিতে হয়েছে তাদের। বিনোদ মেহতা, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য সেটা কি পারেননি? তাহলে জঙ্গলমহলে কি হতে পারে, আমরা অনুমান করতে পারি না?

সিঙ্গুরের তাপসী মালিককে ধর্ষিতা হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হলো কেন? নন্দীগ্রামে কেন ধর্ষিতা হতে হলো—আফ্‌রোসা বিবি, রাধারাণি আড়িদের? কেন বুলেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চৌদ্দজনকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকতে হলো নন্দীগ্রামে? হাইকোর্ট সেই গুলিবর্ষণকে বলেছে 'wholly unconstitutional'।—কিন্তু এতদিনেও কারও শাস্তি হয়েছে কি? কেন জননী ইটভাটায় ধৃতদের ছেড়ে দেওয়া হলো? পুলিশের সঙ্গে কোনও সভ্য দেশে চটি-পরা ক্যাডাররা অভিযানে নামে? এখানে কিন্তু সেটাও হয়েছে।

এস.পি.-র ছক অনুসারে নন্দীগ্রামে পুলিশ-পিকেট সরিয়ে ঘটানো হয়েছিল রক্তাক্ত 'সূর্যোদয়'। মহা উল্লাসে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন (অবশ্যই ভুল ইংরেজীতে)—ইটের বদলে পাটকেল মারা হয়েছে। তাঁর মতে, তৃণমূলীরা গুলি চালাত নিরীহ, কম্‌রেডদের দিকে—কিন্তু হাঁটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব। তাঁর কাছে খবর ছিল খেজুরীর দিক থেকেই (অর্থাৎ ক্যাডারদের বন্দুকের দ্বারা) গুলি ছুটে আসে। সাংবাদিকদের হিসেবে, সংখ্যাটা দিলে ৪/৫ হাজার। অবশ্যই স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অস্ত্রাগারটিকে দখল করা ও অপরাধীদের ধরে আদালতে তোলার দায়িত্বটা ছিল কার? এশিয়াটিক সোসাইটির, নাকি রামকৃষ্ণ মিশনের?

এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসই চলছে জঙ্গলমহলে।

গোড়ার কথাটা একটু ভেবে দেখুন। মুখ্যমন্ত্রীর কন্‌ভয় চলে যেতেই একটা বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তাতে কিন্তু কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে লাইনের তার মাটির ওপর দিয়ে কয়েক কিলোমিটার গেল—নিরাপত্তাকর্মী বা ক্যাডারদের সেটা চোখে পড়েনি কেন?

তাহলে কি গোটা ব্যাপারটাই ছিল সাজানো নাটক? অথচ তারই সূত্র ধরে চলেছিল ব্যাপক সন্ত্রাস। পুলিশী তাণ্ডবে হঠাৎ তছনছ হয়ে গিয়েছিল আদিবাসীদের শান্ত জীবন। মাওবাদী ছেলেরা মেয়ে সেজেছে কিনা সেটা জানার জন্য মেয়েদের বিবস্ত্র করা হয়েছে। ধরা হয়েছে বহু নিরাপরাধ মানুষকে। ছিতামণি মুর্মুর চোখ নষ্ট করা হয়েছে, লক্ষ্মী প্রতিহারের গর্ভস্থ সন্তানকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ঘর ছেড়ে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হয়েছে বহু মানুষকে।

এই তাণ্ডবের প্রতিবাদেই গড়ে উঠেছে জনসাধারণের কমিটি। প্রথমে ১৩টা ও পরে

> **"সরকার একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাক—এই অভিযানের জন্য এ পর্যন্ত কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সেই টাকা দিয়ে জঙ্গলমহলকে সোনার খনি করে দেওয়া যেত না? যে ভাত দিতে পারে না, তার কিল মারার গোঁসাই হওয়া সাজে কি?"**

(এরপর ৪ পাতায়)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রদায়িক বাজেট

(১ পাতার পর)

দাঁড়ায় ১৪.৮৯ শতাংশ। ২০০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে এ রাজ্যে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ২.১১ কোটি (২৬.২৭ শতাংশ)। মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে রাজ্য সরকার তাই চেষ্টা চালাচ্ছে 'ঋণদানের এই লক্ষ্যমাত্রা পুনর্বিবেচনা ও পরিমার্জনা করে' সংখ্যালঘু সংখ্যানুপাতে নিয়ে যাওয়ার। ব্যাঙ্ক ঋণ ছাড়াও রাজ্য সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য মেয়াদী ঋণ কর্মপ্রকল্প, গুচ্ছ ঋণ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মপ্রকল্প চালু করেছে। যার মাধ্যমে ২০১০-১১ আর্থিক বছরে যথাক্রমে ৬৫ কোটি, ১২ কোটি এবং ২৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। এখানেই শেষ নয়, সংখ্যালঘু মহিলাদের বার্ষিক ৩ শতাংশ সুদে ২০১০-১১ সালে ২০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে। এই ঋণের ৫০ শতাংশই ভর্তুকি। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতাকে ওই পরিমাণ অর্থ সরকারকে আর ফেরত দিতে হবে না।

২০০৯-১০ সালে এ রাজ্যে সংখ্যালঘুদের ভিতর প্রাক-প্রাথমিক বৃত্তির জন্য ২৫.২৯ কোটি টাকা, মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তির জন্য ১৭.৭২ কোটি টাকা, কারিগরি শিক্ষাক্রমের জন্য ১৫.৮৯ কোটি টাকা খয়রাত করা হয়। এছাড়াও রাজ্য সরকার একাদশ থেকে স্নাতক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য বিগত অর্থবর্ষে ৫.৪৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এছাড়াও ১৬-৩২ বছর বয়সসীমার সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীরা ২,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষা ঋণ পাবে বিনা সুদে। কলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের বাসস্থানের অসুবিধা দূর করতে রাজ্য সরকার কারমাইকেল ও বেকার হোস্টেল সম্প্রসারণের জন্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করছে। দশটি মুসলিম ছাত্রী আবাস দশ জেলায় আগে থেকেই চালু ছিল। আরও ৫টি ছাত্রী আবাস নির্মাণের কাজে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই হাত দিয়েছে। ২০১০-১১ সালে নির্বাচিত জেলা ও মহকুমায় নতুন দশটি ছাত্রাবাস গড়ে তোলা হবে। শিয়ালদহে প্রায় ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বু-আলি ছাত্রাবাস পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। কলকাতায় কর্মরতা মুসলমান মহিলাদের জন্য প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আবাস নির্মাণের কাজ চলছে। মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক আই টি আই নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। বর্তমানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় ধরনের পাঠক্রম চালু হয়েছে। কোরান থেকে তথ্যপ্রযুক্তি-সব ধরনের বিষয় এখানে রয়েছে। এই কোর্সগুলির ৯০ শতাংশ শুল্ক রাজ্য সরকার ভর্তুকি হিসাবে দিচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান মহিলা ক্যাম্পাসের জন্য কলকাতায় কে আই টি-র কাছ থেকে মাত্র ১৭.৫০ কোটি টাকা দিয়ে ১৪৮ কাঠা জমি কেনা হয়েছে। এই নতুন ক্যাম্পাসের জন্য রাজ্য সরকার ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করতে চলেছে। মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত এন জি ও-গুলিকেও রাজ্য সরকার বিপুল আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু করেছে। এই সব এন জি ও-র মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মপ্রকল্পের ২৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকার ব্যয় করবে। মুসলমান যুবক-যুবতীদের কারিগরি, বৃত্তি শিক্ষা, কোচিং প্রভৃতির জন্য আল-আমীন মিশনকে ৯৪.২০ লক্ষ, গাইডেন্স ফাউন্ডেশনকে ২৪.৩২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মুসলিম এন জি ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকার সহায়তা দিচ্ছে। এ রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৩২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আরও ৩০০টি আবেদন রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারী স্বীকৃত মাদ্রাসার সংখ্যা ৫৮১টি। বর্তমানে ১২টি ইংরাজি মাধ্যমসহ মোট ২৯১টি নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্যোগ সরকার নিয়েছে। এছাড়াও নতুন ২৭৩টি মাদ্রাসাকে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। এই সব মাদ্রাসায় ১০০০টি নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার ২০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। শৌচাগার, পানীয় জল সরবরাহের জন্য ২.২৫ কোটি টাকা, মাদ্রাসার সকল ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পোষাক সরবরাহের জন্য ৩.৮০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া মাদ্রাসা সমূহে শিশুদের খেলাধূলার জন্য প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। সরকার স্বীকৃত মাদ্রাসাগুলির জন্য নতুন ৪০০০ শিক্ষক নির্বাচনের কাজ শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য ২০১০-১১ সালের বার্ষিক বরাদ্দ ৫৭.৬১ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। উর্দুভাষা প্রসারের জন্য রাজ্য সরকার উর্দু অ্যাকাডেমির উন্নতিকরণে হাত দিয়েছে। গত বছর এর মাধ্যমে ১০৩০৮৯টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত হয়েছে। অ্যাকাডেমি ভবন বর্ধিত হয়েছে। খোলা হচ্ছে উর্দু গ্রন্থাগার, মুদ্রিত হচ্ছে নতুন নতুন কেতাব, তৈরি হচ্ছে উর্দু ডিটিপি সফ্‌টওয়ার, দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের উর্দু পত্রিকাসমূহকে ভর্তুকি।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সহায়তায় দ্বিতীয় হজ টাওয়ার দমদম এয়ারপোর্টের কাছেই ভি আই পি রোডে শুরু হয়ে গেছে। এই কাজে ৩ কোটি ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। আরও ৩ কোটির সংস্থান এ কাজে রাজ্য সরকার রেখেছে। গত বছর এ রাজ্য থেকে ৭১৪৭ জন হজে যান। এবছর রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে তীর্থযাত্রী বৃদ্ধির আশা করে বিশেষ সহায়তা রাশি হিসাবে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা খরচ করবে।

মুসলমানদের কবর রক্ষার্থেও রাজ্য সরকার খুবই তৎপর। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ১০২টি কবরস্থানের সীমানা প্রাচীরের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০০৯-১০ সালেই ৫ কোটি টাকা খরচ করে ৫০টির মতো কবর স্থানের প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। এই খাতে এ বছরের বাজেট ৬ কোটি টাকা ধার্য হয়েছে।

এ রাজ্যে মুসলমানদের জন্য রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক এ ধরনের আরও বহু উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মোটামুটি ভাবে তারই একটি রূপরেখা এখানে দেওয়া হলো। এই সকল তথ্যের পরে আর বিশেষ ব্যাখ্যার মনে হয় প্রয়োজন পড়ে না। সব কিছুই বর্তমানে রাজ্য সরকার ধীরে ধীরে ধর্মীয় সংখ্যানুপাতে ব্যয় করার দিকে এগোচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তো তাও ছাড়িয়ে গেছে। এই লেখার পরিশেষে সরকারের কাছে আমাদের বিনীত প্রশ্ন—দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের করের অর্থে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পিছনে খোলামকুচির মতো অর্থ ব্যয়ে হয়তো ভোটব্যাঙ্ক সংহত হতে পারে কিন্তু আখেরে এই তোষণে দেশের প্রকৃত উন্নতি কতটা হতে চলেছে? দ্বিতীয়ত, সবকিছুই যদি সংখ্যানুপাতে হয় এবার আমাদের খুঁজে বার করার সময় এসেছে মুসলমান সম্প্রদায় কত টাকা করপ্রদান করে কত টাকার সুবিধা নিয়ে যাচ্ছে। সব কিছুই যখন বর্তমানে সংখ্যার খেলা তখন এই অঙ্কের হিসাবও আমরা করবো না কেন?

জঙ্গলমহলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

(৩ পাতার পর)

২১টা ছবি তোলা হয়েছিল। মানুষ মূলত চেয়েছিলেন এই তাণ্ডব বন্ধ হোক এবং পুলিশ-কর্তারা ক্ষমা চান।

সেই সময় খোলা মনে তাঁদের সঙ্গ বসলে এবং দুঃখ প্রকাশ করলেই ব্যাপারটাই সহজ হয়ে যেত। কিন্তু সরকারের ইজ্জৎ লেপে গেল। শাসকদলের নেতারা তো হামেশাই ভুল স্বীকার ও দুঃখ প্রকাশ করেন—১৯৪২ সালে ভুল হয়েছিল, নেতাজীকে 'কুইস্‌লিং' বলা ভুল হয়েছিল, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলা ভুল হয়েছিল, ১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণ নিয়ে দলের অবস্থানে ভুল হয়েছিল, সোভিয়েত-লাইন নেওয়া ভুল হয়েছিল, সিঙ্গুর ভুল হয়েছিল, নন্দীগ্রামে গুলি চালানো ভুল হয়েছিল। না হয়, আরেকটা ভুল স্বীকার করা হোত।

কিন্তু তার বদলে শুরু হলো দমননীতি। ফলে বৃদ্ধা, শিশু, নারী, পুরুষ-সবাই রাস্তা কেটে, গাছ ফেলে, লাঠি নিয়ে শুরু করেছেন এক অদম্য জনবিদ্রোহ। গত বছরের জুন মাস থেকে নেমেছে যৌথবাহিনী। বেড়েছে তাণ্ডব। ভুল করে ধরা হয়েছে ছত্রধর মাহাতোকে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে লালমোহন টুডুকে। তাঁর মৃতদেহ হস্তান্তর নিয়ে চলেছে নাটক। একজন ও. সি.-কে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে মুক্ত করা হয়েছে ২৩ জন বন্দিনী নারীকে—পরে দেখা গেছে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও মামলাই নেই।

প্রশ্ন অনেকই আছে।

বছর খানেক ধরে চেষ্টা করেও যৌথ বাহিনী জঙ্গলমহলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারল না কেন? কয়জন মাওবাদীকে ধরা গেছে ইতিমধ্যে? সেখানকার সবাই মাওবাদী? সেখানকার জঙ্গলে আগুন দিতে হলো কেন? কেনই বা মানুষ দলে দলে পালাচ্ছেন ঘরবাড়ি ছেড়ে?

কেউ ভয়ে মাওবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন, কেউ করছেন সহানুভূতি পেয়ে কেউ আবার ক্ষোভে। ভদ্র সবরকে হত্যা করা হলো কেন?

চম্বলের পুত্‌লীবাঈয়ের কথা মনে পড়ছে।

পুলিশের গুলি তাঁর হাতে লেগেছিল। আহত অবস্থায় তিনি একটা বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে দিব্যি রুটি বানানো শুরু করেছেন—পুলিশ তাঁর হদিশই পায়নি।

এমনটাই হয়েছে জঙ্গলমহলে?

কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? ছত্রধর মাহাতো? মাওবাদীরা? নাকি আমাদের কর্তাব্যক্তিরা?

সরকার একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাক—এই অভিযানের জন্য এ পর্যন্ত কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সেই টাকা দিয়ে জঙ্গলমহলকে সোনার খনি করে দেওয়া যেত না? যে ভাত দিতে পারে না, তার কিল মারার গোঁসাই হওয়া সাজে কি?

জঙ্গলমহলের মানুষগুলো যুগ-যুগ ধরে বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-অন্যায়-অবিচার সয়ে এসেছেন। ডুমুর, সাপ, পিঁপড়ের ডিম, লতাপাতা খেয়ে তাঁরা দিন কাটান, অনেকে মারা যান অনাহারে, অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে। কাঠ কেটে, শালপাতা কুড়িয়ে, কাঁক্‌ড়া-শামুক ধরে অনেকে পেট চালান। এখানে না আছে বিদ্যুৎ, না আছে পানীয় জল, পাকা রাস্তা, হেল্‌থ-সেন্টার, বড় স্কুল, ভাল কলেজ। অনেকে সারা জীবনে ডাক্তারই দেখেননি। রেশনে খাদ্য নেই, স্কুল-বাড়ির ছাদ নেই, হেল্‌থ-সেন্টারে ওযুধ নেই। অনেকের বাইরে আসার মতো কাপড়ও নেই। তাঁরা জন্ম নেন মরার জন্যই এবং মারা যান জীবন থাকতেই।

তবু তাঁরা শান্তিতে ছিলেন, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম তাঁদের এক নতুন চেতনা এনে দিয়েছে, আর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে প্রতিরোধের স্পৃহা। এভাবে কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটে।

যৌথ-বাহিনী দিয়ে কিছু হবে না। সেবা আর কল্যাণবোধ নিয়ে সরকার তাঁদের মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ এনে দিক। জাগিয়ে তুলুক অন্তর্নিহিত দেবত্বকে। তখন কর্তাব্যক্তিরাও বুঝবেন গাঁয়ের মানুষ কত সহজ, সরল ও উদার।

কেদার-বদ্রীনাথ রেলপথ

(১ পাতার পর)

হয়েছিল।

প্রস্তাবিত এই রেলপথটি গঙ্গার পাশাপাশিই চলবে। ঋষিকেশ থেকে কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত রেলপথের দৈর্ঘ্য হবে ১৫০ কিলোমিটার যা সড়কপথের থেকে ২৫ কিমি কম। দেরাদুন, টেহরী, রুদ্রপ্রয়াগ, চামেলি জেলার মধ্য দিয়ে রেলপথটি যাবে।

পাকিস্তানে থাকতে নারাজ

(১ পাতার পর)

এবং পাক-অধিকৃত) মোট ৩৭৭৪ জনের মতামত নিয়েছেন। গতবছরের সেপ্টে স্বর-অক্টোবরে গৃহীত এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের ৪৪ শতাংশ অধিবাসীই স্বাধীনতার পক্ষে, অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীরে বসবাসকারীদের মধ্যে এই শতাংশটাই ৪৩-এ গিয়ে ঠেকেছে। ব্র্যাডনক আরও জানিয়েছেন—"কাশ্মীরিরা আমাদের সমীক্ষায় যেভাবে সাড়া দিয়েছে তাতে প্রমাণিত হচ্ছে—গোটা কাশ্মীর উপত্যকা থেকে আস্তে আস্তে সমর্থন হারাচ্ছে উগ্রপন্থী জেহাদীরা। সত্যি কথা বলতে কি, জঙ্গিদের বহু প্রতিপক্ষ একটা সময়ে কাশ্মীরে ছিল কিন্তু তারা সমাধানের (ভারত-পাক সীমারেখা নিয়ে) কোনও রাস্তা না দেখানোতেই জঙ্গিদের বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয়েছিল। ৮৪-৯৮ শতাংশ মানুষই উপত্যকায় জঙ্গি সন্ত্রাসে বিরক্ত। তারা আমাদের সমীক্ষকদের সামনে এই ব্যাপারে তীব্র সমালোচনা করেছেন।"

রাজ্য রাজনীতি

নির্বাচনী সু-‘বৌদ্ধ দের’ ‘সু’-বচন

নিশাকর সোম

নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে নানা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বক্তব্যে ‘সু-বচন (?)’ বেরিয়ে এসেছে। এ-ব্যাপারে ফার্স্ট হয়েছেন সিপিএমের রাজ্য-কমিটির সম্পাদক বিমান বসু। তিনি মিট দ্য প্রেস-এ কুৎসিত ভাষায় পরিবর্তনের কথা বলেছেন। বিমানবাবুর “বিদ্যাসাগর ভজনা” শোভা পায় না। বিমানবাবুকে প্রত্যুত্তর দেওয়া যায় ঠিক বিমানবাবুর কথাতেই।

এরপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেববাবু বিজেপি-র সমর্থকদের ভোট দেবার আবেদন জানিয়েছেন। বিজেপি আজ নিজের অবস্থানকে সামনে আনতে পেরেছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদের অভিলাষিণী তৃণমূল নেত্রী বলেছেন—রাজ্যে তৃণমূল আর সিপিএম থাকবে। আর কোনও দল থাকবে না। অর্থাৎ তিনি দ্বিদলীয় ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তৃণমূলনেত্রী আরও বলেছেন যে, “জনগণ তাদের এ-রাজ্যে প্রধান দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কারুর দয়াতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেই—নিজেদের জোরে আছি।”

তৃণমূলের একনেতা বলেছেন, “বহিরাগতদের”—সিপিএম গুণ্ডাদের বেঁধে ঘরে ফেলে রাখ্‌বো। পুলিশ ডেকে হাতে তুলে দোব। এর মাঝে কিছু মালিশ-পালিশ করা হবে।”

সিপিএম-এর রাজ্য-কমিটির সম্পাদক বিমান বসু মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে অশ্লীল কথাবার্তা বলে নিজের নিম্নরুচির পরিচয় দিয়েছেন। বিমানবাবু আবার বিদ্যাসাগর মেলা করেন! বিদ্যাসাগর মহাশয় যেভাবে সাধু ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তা-থেকে বিমানবাবু কোনও শিক্ষাই নেননি। আসলে বিমানবাবুরা শঠতা-ছলনার আশ্রয় নিয়েই রাজনৈতিক ফয়দা তুলে থাকেন। বিমানবাবুর কথার ভাষা শুনে মনে হয় তিনি একজন “রক-বাজ”। বিমানবাবু জয়দেব বসুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ ভাষা-বিদ্যার প্রশিক্ষণ নিন। নচেৎ বিমানবাবুর কথাবার্তা নিচের তলার কর্মীরা রপ্ত করে নেবেন। বিমানবাবু-বুদ্ধ বাবু বিনয়বাবুদের সিপিএম-এর কর্মীদের একাংশ পছন্দ করেন না। পার্টি-সম্মেলনে যদি অবাধে ভোটদেবার ব্যবস্থা থাকে, তবে এই ত্রয়ী পরাজিত হবেনই।

সিপিএম-এর প্রচারে শুধুই নেতিবাচক-খেউড়। কারণটা খুবই সোজা—ইতিবাচক বলার তো কিছুই নেই!

ওদিকে তৃণমূল নেতারা তাঁদের বক্তৃতায় কংগ্রেসকে বিশ্বাসঘাতক-পরজীবী বলে অভিহিত করছেন। কোনও কোনও তৃণমূলী বলে থাকেন—“তাদের দয়াতেই ইউপিএ সরকার টিকে আছে।” তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি এক সভায় বলেছেন—“দীপা দাসমুন্‌সি কালনাগিনী।” তৃণমূলের পৌরনির্বাচনে মূল স্লোগান— বিধানসভা অধিকার করে রাজ্যমন্ত্রিত্ব অধিকার করা। এর বিপরীতে সিপিএম বল্‌ছে—“তৃণমূল এলে লণ্ডভণ্ড করবে।” মুসলিম এলাকায় নেত্রী মুসলিমদের ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিলেন। লক্ষণীয়, সদ্য-দলত্যাগী সুব্রত মুখার্জিকে তৃণমূল কোনও সভাতেই বক্তা করেনি। তাঁকে একদল তৃণমূলী মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁরা তাঁকে ধান্দাবাজ-সুবিধাবাদী বলে থাকেন। সুব্রতবাবু শুধু তাঁর আত্মীয়ার ওয়ার্ডেই প্রচার করছেন। নির্বাচনী প্রচারের শেষ লগ্নে প্রণব মুখার্জী বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মমতা-কে তীব্র সমালোচনা করে এক ঝাঁঝালো বক্তৃতা করেছেন। তিনি বলেছেন “হোক না শক্তি পরীক্ষা, দেখ্‌তে চাই কে নিজের শক্তিতে জেতে? কংগ্রেসকর্মীদের সাহায্যেই লোকসভায় জেতা হয়েছিল। ৩০ তারিখে প্রমাণ হবে ব্যক্তিগতভাবে কার প্রভাব কতটা।”

নেত্রী তো ২০০১-এ এন ডি এ ছাড়লেন। আবার মন্ত্রী হবার জন্য এন ডি এ-তে গেলেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জী আরও বলেছেন—“জোট সরকার কি ভাবে চালাতে হয় তা আমরা জানি। আমি রাজনীতিতে তিনদিনের যোগী নই। পার্লামেন্টের সবচেয়ে পুরানো সদস্যদের মধ্যে একজন। ১৪৭ জনকে নিয়ে যদি প্রথম পাঁচ বছর চালাতে পারি তবে ২০৬ জন নিয়ে তার থেকে ভালোভাবে চালাবো।” নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে জ্ঞানেশ্বরীর রেল দুর্ঘটনাকে নিয়ে নানা প্রচারের মধ্যে ইঙ্গিত করা হচ্ছে “সিপিএম-মাও-এর যৌথ কাজ” হিসেবে (?!)

এই পৌর নির্বাচনের পর কংগ্রেস এবং তৃণমূল উভয়ের মধ্যেই এক আলোড়ন সৃষ্টি হবে। পার্টি ভাঙাভাঙি হবেই।

আর সিপিএম-এর আগস্ট মাসের প্লেনামে প্রকাশ-পিল্লাই বুদ্ধ-বিমান-বিনয়-এর বিনাশ ত্বরান্বিত করবে। নিরুপম তাল বুঝে প্রকাশের দিকে ঝুঁকেছেন। পরবর্তীতে এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চিত্র আরও উদঘাটিত হবে। তবে বিমান-বুদ্ধ-বিনয়—এই ত্রয়ীর বিদায় আসন্ন।

> **প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জী আরও বলেছেন—“জোট সরকার কি ভাবে চালাতে হয় তা আমরা জানি। আমি রাজনীতিতে তিনদিনের যোগী নই। পার্লামেন্টের সবচেয়ে পুরানো সদস্যদের মধ্যে একজন। ১৪৭ জনকে নিয়ে যদি প্রথম পাঁচ বছর চালাতে পারি তবে ২০৬ জন নিয়ে তার থেকে ভালোভাবে চালাবো।”**

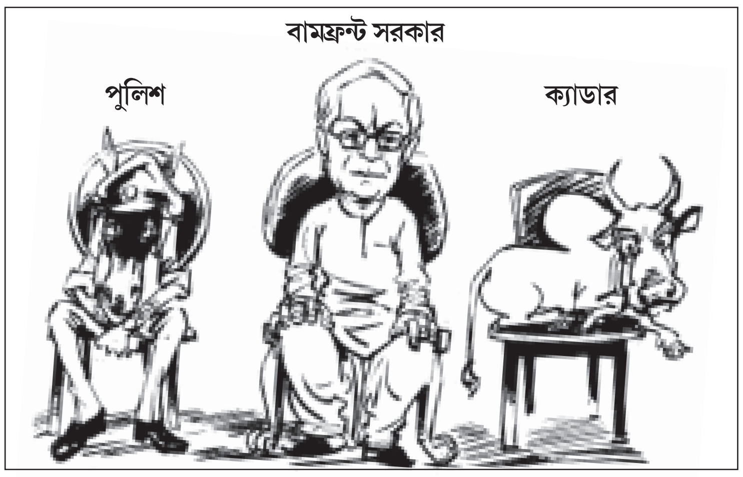

দিলীপ দোণ্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইনি জেসিকা ওয়াটসনের পুরুষ ভার্সান। নাম দিলীপ দোণ্ডে। পেশায় নৌবাহিনীর কম্যান্ডার। জেসিকার বাহনের নাম ছিল যেমন এলা বেচ, তেমনই এনার বাহনের নাম আই এন এস ভি মহাদেব। জেসিকা পাড়ি দিয়েছিলেন ২৩,০০০ নটিক্যাল মাইল, ইনি ২১,৬০০ নটিক্যাল মাইল।

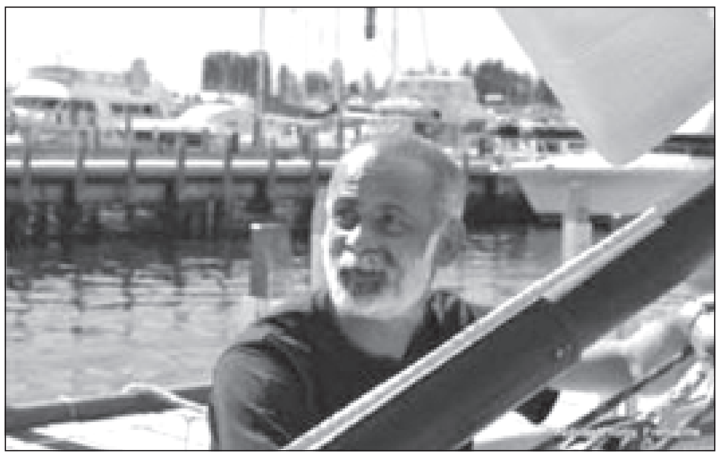

দিলীপ দোণ্ডে

জেসিকার সাথে এনার সাযুজ্য খুঁজতে চাইলে, সেটা বিস্তর পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে জেসিকার সদ্য কীর্তির (স্বস্তিকা ৩১ মে, ২০১০ দ্রষ্টব্য) সঙ্গে, এনার কীর্তিও যখন প্রায় তুল্যমুল্য, তখন তুলনাটা আসবেই। যদিও জেসিকার মাত্র ১৬ বছর বয়সটা খেয়াল রাখলে সেই তুলনাটা না টানাই বাঞ্ছনীয় বলে বোধ হবে। কিন্তু দোণ্ডের কৃতিত্বটা কোনওমতেই ফেলনা নয়। কারণ প্রথম কোনও ভারতীয় হিসেবে সাত সমুদ্র তেরো নদী ঘুরে ফেলার চিরকালীন কৃতিত্বটা নিজ স্বন্ধে ইতিমধ্যেই তুলে ফেলেছেন তিনি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করে গত ২২ মে যখন মুম্বাই উপকূলে নোঙর ফেলল আই এন এস ভি মহাদেব তখন দোণ্ডে-কে সম্বর্ধনা দিতে হাজির ছিলেন খোদ উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি এবং নৌ-বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল নির্মল ভার্মা। তবে সমস্ত কৃতিত্বটায় কেবলমাত্র নিজেকেই জাহির করছেন না তিনি, কৃতিত্বের ভাগ দিচ্ছেন তাঁর ২৭৬ দিনের সমুদ্রপথের একমাত্র সঙ্গী অর্থাৎ জাহাজটিকে। গত বছরের ১৯ আগস্ট রওনা হন তিনি। রেকর্ড গড়ার একটা সুপ্ত বাসনা ছিলই। সেটা বিশ্বের আঙ্গিকে না হয়ে ভারতের আঙ্গিকে হওয়ায় বিন্দুমাত্র খেদ নেই তাঁর। দিলীপ দোণ্ডের এই ঐতিহাসিক যাত্রা পথের নাম দেওয়া হয়েছিল সাগর-পরিক্রমা। আর এই পরিক্রমাকালে বার চারেক নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে আই এন এস ভি মহাদেব। জাহাজটি মুম্বই তীরবর্তী ফিনিশিং লাইন টাচ করতেই ভারতীয় নৌ-বাহিনীর একটি ফাস্ট অ্যাটাক ক্র্যাক্ট সহ দু’টো স্পীডবোট জল-কামান ফাটিয়ে দিলীপ দোণ্ডেকে অভ্যর্থনা জানায়। তার ওপর তাতে উপস্থিত ছিলেন নৌ-প্রধান স্বয়ং। সবমিলিয়ে আত্মহারা হয়ে যান দোণ্ডে। উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন—‘দোণ্ডের কীর্তি প্রতিটি ভারতবাসীকে খুশি এবং গর্বিত করেছে। এই ধরনের বিশ্বভ্রমণে তিনিই প্রথম ভারতীয় এবং নিজের কাজটা খুব ভালভাবেই করতে পেরেছেন তিনি।’ প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত ১৭৫ জন ব্যক্তি সফল হয়েছেন এহেন জলপথে বিশ্বভ্রমণ করতে। বয়সের দিক দিয়ে কম বয়সে বিশ্বজয় করে নিঃসন্দেহে বিশ্বরেকর্ড করেছেন জেসিকা, কিন্তু সময়ের নিরীখে বিশ্ব পর্যায়ে এই রেকর্ডটা এক ফ্রেঞ্চ , ফ্রান্সিস জোয়ানের দখলে। তিনি মাত্র ৬৭ দিন ১৩ ঘন্টা ৩৪ মিটি এবং ৬ সেকেন্ড সমুদ্রপথে পৃথিবী-ভ্রমণ করেছিলেন। যাই হোক, ভারতীয়রা অ্যাডভেঞ্চ ার বিমুখ—এই অপবাদ অন্তত ঘোচার কথা দিলীপ দোণ্ডের এই সাফল্যের পর!

অসমে অনুপ্রবেশের বিভীষিকা

বাসুদেব পাল ॥ ডঃ ভূপেন হাজারিকার গলায় তাঁরই রচনা ও সুরারোপিত গানের কথাগুলো যেন কয়েক দশকের মধ্যেই রূঢ় বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে—"আজির অসমীয়াই সংগ্রাম না করিলে অসমতে ভাগানিয়া হবে।" বাংলায় যার মর্মার্থ হলো, এখনও যদি তারা সংগ্রাম বা আন্দোলন না করে তাহলে অসমীয়াদের নিজের দেশেই উদ্বাস্তু হতে হবে। বাস্তবে প্রকৃত অবস্থাটা এখন তাই।

অসমের মূল অধিবাসীরা প্রথমে মাটির উপর থেকে তাদের অধিকার হারাচ্ছে। তারপর নিজেদের পরিচিতি। স্বদেশেই উদ্বাস্তু হওয়ার বিপদটা যারা বয়ে আনছে তারা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী। এই অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে যেখানে মূল অসমবাসীরা প্রতিটি পদক্ষেপেই একরকম ভয় ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। একশ্রেণীর রাজনীতিবিদরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ওই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়ে তাদেরকে সর্বতোভাবে আড়াল করে চলেছে। আর এরই পরিণতিতে ওই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণ করার মতো অবস্থায় পৌঁছেছে।

সম্প্রতি একটা ঘটনা ঘটেছে ওরাং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে। সেখানে সশস্ত্র বাংলাদেশীরা জোর জবরদস্তি জায়গা-জমি দখল করে ঘর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল। পরে তাদের ওখান থেকে উৎখাত করা হয়। তবে এঘটনা হিমশৈলের উপরিভাগের ভগ্নাংশ মাত্র। যদিও ওই জবরদখলকারীদের হঠানো গিয়েছে, তাই বলে জোর দিয়ে বলা যাবে না যে, ওরা ভবিষ্যতে আর ফিরে আসবে না। স্থানে স্থানে অসমের জমি ক্রমশ গ্রাস করছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা। নির্বাচনে ফায়দা তোলার জন্য কিছু তথাকথিত সেকুলার রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ওই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের কোল বালিশের মতো আগলে রাখছে। প্রশ্ন উঠেছে, নগাঁও এবং মরিগাঁও থেকে যে সকল বাংলাদেশীরা অরেঞ্জ রিজার্ভ ফরেস্টে জবরদখল করতে এসেছিল তারা কোথায় মিলিয়ে গেল? তারা আদতে কোথা থেকে এসেছিল?

খোদ গুয়াহাটি শহরে বাংলাদেশী শ্রমিকদের সংখ্যা দিন দিন ব্যাপকহারে বাড়ছে। বাংলাদেশ থেকে এসেই ওই অনুপ্রবেশকারীরা শ্রমিকের কাজে লেগে যায়। তাদের দাপট এতটাই সংগঠিত যে, একজন সাধারণ বাংলাদেশী শ্রমিক সেল ফোনে খবর দিয়ে দুইশতাধিক সহকর্মীকে জড়ো করতে পারে। এধরনের বাংলাদেশী শ্রমিকরা এখন আর সস্তায় কাজও করতে চাইছে না। তারা এতটা সাহস সঞ্চয় করেছে যে, স্থানীয় ঠিকাদারদের কাছে চুক্তির বাইরে বেশি মজুরী দাবী করছে। সম্প্রতি গুয়াহাটি শহরের কেন্দ্রস্থলে যে ঘটনা ঘটেছে তা চোখ খুলে দেবার মতো। একটি বাড়ি তৈরির কাজে নিযুক্ত বাংলাদেশী শ্রমিকদের সর্দার স্থানীয় ঠিকাদারের কাছে অতিরিক্ত অর্থ দাবী করে। মালিকপক্ষ তা দিতে রাজী না হওয়ায় ওই বাংলাদেশীরা কন্ট্রাক্টরের সহকারীকে অপহরণ করে তাদের ডেরায় নিয়ে যায়। জানিয়ে দেয়, দাবীমতো টাকা না পেলে অপহৃতকে ছাড়বে না। বড় সংখ্যায় বাংলাদেশী শ্রমিকরা ঘটনাস্থলে একত্রিত হয়েছিল। তাদের কথোপকথন থেকে জানা গেল—আগের থেকে পরিকল্পনা করেই অপহরণ করা হয়েছে। পরদিন অপহৃত ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

অসমের একটি থানায় ধৃত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা।

অন্য একটি ঘটনায় পুলিশই একদল বাংলাদেশীকে তাড়া করেছিল। তারা একটি ঘেরা ফাঁকা কম্পাউণ্ডে দেওয়াল টপকে ঢুকে শেড বানাতে শুরু করেছিল। যদি কেউ গুয়াহাটি শহরের চারদিকে একটু নজর করে দেখেন তাহলেই বাংলাদেশীদের চোখে পড়বে—রিক্সাওয়ালা, অটো রিকসাচালক কিংবা জনমজুর হিসেবে তারা স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করছে। তারা শহর জুড়েই বর্তমান এবং এতটাই সু-সংগঠিত যে যদি কোনও যাত্রীর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝামেলা হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার পক্ষে ২০/২৫ জন জুটে যাবে।

শুধু গুয়াহাটি শহরই নয়, গ্রামেও বাংলাদেশীরা অনুপ্রবেশ করে বসে পড়ছে। গ্রামে কৃষি শ্রমিক হিসেবেও বাংলাদেশীদের দেখা যাবে। সার্বিকভাবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, বাংলাদেশীরা কিভাবে অসমকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলেছে। আর যত দিন যাচ্ছে, ডঃ ভূপেন হাজারিকার গানের কথাটা ততই সত্য হয়ে উঠছে—মূল অসমীয়ারা নিজভূমেই উদ্বাস্তু হতে চলেছে। কেননা, সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া, ফরেনার্স অ্যাক্ট সবই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কার্যত ব্যর্থ। অবাধে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ চলছে আর শাসক দল এবং বিরোধীদল চুপচাপ। অনুপ্রবেশ নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটা। আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী দলগুলোও তো নিজেদের স্বার্থের জন্য অনুপ্রবেশ বিষয়ে নীরব। কেননা বাংলাদেশকে তারা নিজের 'ঘর' করে নিয়েছে। তারা কী করে অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে? ওই উগ্রপন্থী দলের নেতারা তো বহাল তবিয়তে সরকারি সুরক্ষায় সপরিবারে বাংলাদেশে বসবাস করছে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের নজর থেকে বাংলাদেশ ওদেরকে অতীতে সব সময় আড়াল করেছে। বাংলাদেশের প্রেমে তারা এতটাই গদগদ যে, নিজের স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের নামকরণও বাংলাদেশীদের নামে করছে। জনশ্রুতি, হয়ত বা বাস্তবও বটে যে, 'আলফা' নেতারা বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারত থেকে নিয়ে (জোরজবরদস্তি) বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে জমা করেছেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত—আলফা'র চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়া (বর্তমানে ভারতের হেফাজতে) বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে অরবিন্দ রায় নামে অ্যাকাউন্ট খুলে ৩,৯০০ কোটি টাকা জমা করেছেন। আবার, জঙ্গি সংগঠন এন ডি এফ বি-এর চেয়ারম্যান নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি বাংলাদেশের ব্যাঙ্কে ৭০ কোটি টাকা হাওলার মাধ্যমে ট্রান্সফার করেছেন। তাই কোনমুখে ওরা বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বলবে? তারা বরং নিজেরাই মুসলমান নাম নিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্টে দেশ-বিদেশ যাতায়াত করছে। সেখানে নির্বিবাদে সংসার পেতেছে।

অতীতে অসমবাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অনেক লড়াই লড়েছে। এখনও তাদের জন্য কিন্তু কোনও সুখবরই নেই। 'অসম চুক্তি' এখন বাতিল, পরিত্যক্ত বা মৃতবৎ। দিনদিন ক্রমশ পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। অসমের প্রতিটি জনগোষ্ঠী অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। এই পরিস্থিতিতে অসমের মূলনিবাসীদের এক হয়ে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশের মোকাবিলা করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। সাম্প্রতিককালে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী প্রগাঢ় হয়েছে। ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এক নতুন মোড় নিয়েছে। এর ফল কিন্তু ভোগ করতে হচ্ছে অসমকে, মূল অসমবাসীদেরকে। আর বাংলাদেশের সরকারি বক্তব্য হলো—একজনও বাংলাদেশী অসমে প্রবেশ করেনি। এই 'সুর' বাংলাদেশে শাসক বদল হলেও একটুকুও বদলায়নি। ভারতের নরম মনোভাব ও দ্বিধাচিত্ততার সুযোগে সামনে চলে আসছে অসমসহ বৃহত্তর বাংলাদেশের পুরনো গেমপ্ল্যানটা। তাই বিপদ শুধু অসমের নয়, গোটা ভারতেরও।

মাওবাদী-লস্কর যোগাযোগের প্রমাণ পেয়েছে গোয়েন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং-এর আশঙ্কাই শেষপর্যন্ত সত্যি হতে চলেছে। গত মে মাস নাগাদ তিনি বলেছিলেন—মাওবাদীদের সঙ্গে পাক-পন্থী জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবার যোগাযোগ থাকতে পারে। যদিও তিনি তাঁর বক্তব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সেদিন দেননি, কিন্তু অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে এমন কিছু তথ্য-প্রমাণ এসেছে যাতে প্রমাণ হয়েছে, লস্কর অতি বামপন্থীদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং বিস্ফোরক দিতে চেয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য।

২০০৯-এর ৪ জুন নতুন দিল্লীতে গ্রেপ্তার হন উমর মাদানি। ৫০ বছর বয়সী এই লোকটি লস্করের আর্থিক-মদতদাতা (ফাইনান্সার) হিসেবে পরিচিত। গোয়েন্দাদের জেরার মুখে তিনি জানিয়েছেন, মাওবাদীদের সঙ্গে 'ওপেন চ্যানেল' গড়ার পরিকল্পনা তাঁরা করছেন। সেই কারণে মাওবাদীদের আর্থিক এবং অন্যান্য 'লজিস্টিক' সমর্থন দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে লস্কর। মাদানী অবশ্য সেইসঙ্গে এও জানিয়েছিলেন নকশালদের সঙ্গে সেই যোগাযোগটা তাঁরা গড়ে তুলতে পারেনি। লস্কর যদি ইতিমধ্যেই মাওবাদীদের সঙ্গে কোনও 'স্বাধীন চ্যানেল' তৈরি করে থাকে, তা তিনি জানেন না বলে মাদানীর দাবী।

যদিও তার এই বয়ানকে ততটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করছেন না গোয়েন্দারা। কারণ মাদানীর মতো লস্কর নেতার সঙ্গে মাওবাদীদের যোগাযোগ হওয়াটা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। কারণ নেপালে লস্করের আর্থিক এবং লজিস্টিক ব্যাপারগুলোর প্রধান ছিল এই মাদানীই। এবং জাল ভারতীয় নোট চক্রের পাণ্ডাও ছিল সে। ২০০৮-এ রামপুরে সি আর পি এফ ট্রেনিং ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার। বরং সেই গ্রেপ্তারের পর ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছিল। মাদানী ভারতীয় যুবকদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে পাকিস্তানের জেহাদী প্রশিক্ষণ শিবিরে তাদেরকে নিয়োগ করত।২০০৬-এ মুম্বই-এ সিরিয়াল ট্রেন বিস্ফোরণের ঘটনায় ধৃত কমল আহমেদ আনসারির কাছ থেকে এই তথ্য উদঘাটন করে গোয়েন্দারা।

রঞ্জন দইমারী

মাওবাদীরা যে সমস্ত আধুনিক এবং 'ইম্প্রোভাইজড' বিস্ফোরক ব্যবহার করছিল সাম্প্রতিক নাশকতাগুলোতে, তাতে করে গোয়েন্দাদের মনে সন্দেহ জাগে। তার ওপরে তল্লাশী চালিয়ে যে মাও-সাহিত্য উদ্ধার করে পুলিশ তাতে অস্ত্র-শস্ত্র এবং বিস্ফোরকের যে বৈশিষ্ট্য আর তার ব্যবহার-পদ্ধতি সম্বন্ধে যা জানা যায়, তার সঙ্গে উপমহাদেশে জেহাদীদের বেশ বড় ধরনের একটা মিল রয়েছে। গোয়েন্দার অনুসন্ধানে ইন্ধন যুগিয়েছে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব্ বড়োল্যান্ড-এর (এন ডি এফ বি) শীর্ষস্থানীয় নেতা রঞ্জন দইমারী। গত পয়লা মে বাংলাদেশ সরকার তাকে ভারতের হস্তে সমর্পণ করে। গোয়েন্দাদের জেরায় দইমারী কবুল করেছে—উত্তর-পূর্বের জঙ্গি-গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে মাওবাদীরা নিয়মিত অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ পাচ্ছে।

দইমারী আরও জানিয়েছেন, আই এস আই, এন ডি এফ বি জঙ্গিদের অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল দু'টি ব্যাচে ভাগ করে। দইমারীর বক্তব্য থেকে গোয়েন্দারা মনে করছেন এন ডি এফ বি বাংলাদেশ ও মায়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর (এন এস সি এন (আই-এম) সহায়তা পেয়েছে। যদিও দইমারীর দাবি, তাদের সংগঠনের সঙ্গে মাওবাদীদের কোনও সংস্রব নেই।

সব মিলিয়ে গোয়েন্দাদের বক্তব্য—মাওবাদীরা উত্তর-পূর্বে যে ক'টি সফল আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে, তার পেছনে সিমি ও আই এস আই নেতৃত্বের মস্তিষ্ক রয়েছে। গোয়েন্দাদের আশঙ্কা—ভারত বিরোধী জোট গড়তে ব্যাপক প্রয়াস চালাচ্ছে মাওবাদী আর লস্কর, দু-পক্ষই।

এন এস সি এন-এর 'নাগালিম্'-এর দাবী বাতিল করা হোক

জে পি রাজখোয়া

স্বাধীনতা প্রাপ্তির (১৯৪৭) প্রায় শুরু থেকেই 'নাগাল্যাণ্ড সমস্যা' মাথাব্যথার কারণ। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তো বটেই, অসম এবং ইদানীং মণিপুর রাজ্য সরকারেরও মাথাব্যথার কারণ। গত ৬০ বছর ধরে এই নাগা-সমস্যা একই রকম রয়েছে। তবে একেবারেই একরকম বললে একটু ভুল হবে—ইন্দিরা গান্ধী যেখানে বলপ্রয়োগ করে সেনা নামিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের 'টাইট' দিয়েছিলেন, সেখানে পরবর্তী কেন্দ্র সরকারগুলি বিদ্রোহী-নাগা নেতাদের সঙ্গে অস্ত্রবিরতি চুক্তির নামে একপ্রকার সমঝোতা করে কাল কাটাচ্ছে। অস্ত্রবিরতি চুক্তির পুরো সুযোগ নিচ্ছে নাগা-বিদ্রোহীরা। আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত রীতিমতো সমীহ করার মতো সামরিক বলে বলীয়ান দুইটি জঙ্গি গোষ্ঠী—এন এম সি এন (আই-এম) এবং এন এস সি এন (খাপলাং)। তবে সমঝোতা অনুযায়ী যুদ্ধ বিরতি ভারত সরকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও তা মেনে চলার দায় নেই ওই জঙ্গিদের। নাগা জঙ্গিরা এখন পাশ্ববর্তী রাজ্য অসম, অরুণাচল এবং মণিপুরের বিস্তৃত এলাকায় ঢুকে পড়ছে। কখনও তোলা আদায় করছে, কখনও অ-নাগাদের নির্মমভাবে হত্যা করছে, কখনও বা নাগা বসতিযুক্ত এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে কার্যত 'গ্রেটার নাগাল্যাণ্ড' বা 'নাগালিম'-এর পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে সচেষ্ট। যুদ্ধ বিরতি সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীগত সশস্ত্র সংঘর্ষ মাঝেমধ্যেই ঘটে চলেছে। তাতে প্রাণহানি হচ্ছে নাগাদেরই। কখনও দুই গোষ্ঠীর যুদ্ধের মাঝে পড়ে নিরীহ নাগরিকরাও মারা যাচ্ছে।

এই ধারাবাহিক সংঘর্ষের একটা মুখ্য কারণ হলো, ১৯৮০ সালের পরে কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত যত সরকার এসেছে এবং বর্তমানে আছে তাঁরা প্রথমত দুর্বল এবং দ্বিতীয়ত হয় তাঁরা উত্তরপূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ে অজ্ঞ। নতুবা জেনেশুনেও অজ্ঞ সেজে সমস্যাটিকে ধামাচাপা দিয়ে রাখছেন। অথচ দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতা বজায় রাখার স্বার্থে কেন্দ্রের উচিৎ 'গ্রেটার নাগালিম্' (অন্যান্য রাজ্যের এলাকা নিয়ে) -এর দাবীকে পুরোপুরি নস্যাৎ করা।

অস্ত্রবিরতি চুক্তির নাটকটা শুরু হয়েছে ১৯৯৬ সাল থেকে। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীদুটির নেতা, ক্যাডাররা নিজ-নিজ প্রভাবযুক্ত বা নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় গোপন আস্তানা গেড়ে শক্তি সঞ্চয় করছে। অন্যান্য (অ-নাগা) জনজাতিদের ভারতের বিরুদ্ধে উসকানি দিয়ে, সেইসঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাপক টাকা কামাচ্ছে। এর উপর তোলা আদায় তো আছেই। ওই গোপন শিবিরগুলো রীতিমতো সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির। এই শিবিরগুলোর অবস্থান অরুণাচল, অসম ছাড়িয়ে মায়ানমার (বর্মা) পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বছরের পর বছর যাবৎ এন এস সি এন (আই-এম) জঙ্গি-গোষ্ঠীর নেতৃদ্বয় আইজাক চিস্যু এবং থুঙলাং মুইভার সঙ্গে শান্তিবার্তা চলছে। যার পোষাকী নাম নাগা-শান্তি বার্তা বা 'নাগা পীস টক'। এখানে উল্লেখ্য, দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ্ নাগাল্যাণ্ড (আইজাক-মুইভা) অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী। এমনকী উত্তর-পূর্বে সক্রিয় জঙ্গি দলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ওই নেতাদের দাবী মতো এর আগে কয়েকদফা শান্তিবার্তা তৃতীয় দেশে (থার্ডকান্ট্রি) প্রায় এশিয়া ইউরোপ জুড়েই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত সরকারের কোনও মধ্যস্থতাকারী ওই বার্তায় যোগ দিতেন। শান্তিবার্তা কুয়ালালামপুর, কিয়াংমল (থাইল্যাণ্ড), আমস্টরর্ডাম, প্যারিস এবং অন্যত্রও হয়েছে। যেহেতু, ওইসব বার্তালাপ সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে হোত না সেজন্য ঠিক কি কি কথাবার্তা হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। বার বার বলা হয়েছে, আলোচনা হৃদ্যতাপূর্ণ, ফলপ্রসূ অথবা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে উভয়পক্ষ ঐক্যমতে পৌঁছাবে বলে আশাবাদী। বিদ্রোহী নাগা নেতাদের দাবী বলে যা শুনি—তা কতটা গ্রহণযোগ্য বা যুক্তিযুক্ত তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। নাগা জঙ্গি নেতারা স্বাধীন সার্বভৌম নাগাল্যাণ্ড চান, স্বায়ত্বশাসন চান অথবা অন্য রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকা নিয়ে গ্রেটার নাগাল্যাণ্ড বা 'নাগালিম'—কোন্‌টা চান?

সম্প্রতি বিদ্রোহী নাগা নেতাদের সঙ্গে দিল্লীতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরমের সঙ্গে 'নাগা-শান্তিবার্তা' আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছে। বিদ্রোহী নাগা নেতারা—আইজাক ও মুইভা এখন নাগাল্যাণ্ডের ক্যাম্প হেব্রনে রয়েছেন। মুইভা এখন তাদের জন্মভূমি মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরের সেই অখ্যাত গ্রাম সোমদাল-এ যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তা নিয়ে মণিপুর এখন উথাল- পাতাল। মণিপুরীরা সেখানে মুইভাকে ঢুকতে না দিতে আন্দোলনে নেমেছেন। অন্যদিকে আবার মণিপুরবাসী নাগারা তাদের নেতা মুইভাকে স্বাগত জানাতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে মণিপুরে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। নাগা জঙ্গি নেতারা ভারতে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে এসেছেন কিনা তা জানা না গেলেও দূরদর্শনের পর্দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম্ এবং তাঁর পূর্বসূরী লালকৃষ্ণ আদবানীর সঙ্গে জঙ্গি নেতাদের করমর্দনের দৃশ্য দেখা গেছে। বিদেশে কোথায় কোথায় ওই জঙ্গি বিদ্রোহী নেতারা থাকেন তা নিশ্চয়ই ভারত সরকারের অজানা নেই। সাম্প্রতিক আলোচনার পরও সমাধানসূত্র মেলেনি। দেখে শুনে মনে হয়, ভারত সরকার বিদ্রোহী নেতাদের কাছে চরম আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী জঙ্গি নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ ছয়দশক ধরে শান্তি-আলোচনার নোংরা খেলাটা দেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে নিতান্তই অপমানজনক এবং বেদনাদায়ক।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের সঙ্গে থুঙলাঙ মুইভা।

সম্প্রতি প্রাপ্ত সূত্রের খবর হলো—নাগা বিদ্রোহের জনক এ জেড ফিজো (বর্তমানে স্বর্গত)-র দল নাগা ন্যাশন্যাল কাউন্সিল (ত্বত্ত্ব্র) ও তার নেত্রী ফিজোর মেয়েকে শান্তি আলোচনায় এতদিন সামিল করা হয়নি। যদিও ফিজোর কন্যা দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পক্ষে বলে শোনা গিয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, নাগা সর্বসাধারণ নাগরিক সমাজ (সিভিল সোসাইটি) নানান রাজনৈতিক মতের অনুসারী।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অবশ্যই চার্চ এবং চার্চের নেতৃবৃন্দ। চার্চের প্রভাব নাগা জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির উপর দারুণ বলে জনমনে বিশ্বাস। জনমত নির্দ্ধারণেও চার্চের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও আছে চার্চের বাইরের নাগা জনজাতি নেতা তথা গোষ্ঠী সর্দাররা (গাঁওবুড়া)—এরা বরাবরই সরকারি শান্তি আলোচনার বাইরেই রয়েছেন। তবে তারা সকলেই নাগা সমস্যা এবং সন্ত্রাসবাদের এক সম্মানজনক সমাধান চান। কতিপয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম একটা কথা প্রতিষ্ঠিত করতে চান যে, এন এস সি এন (আই-এম) নেতারা যে সকল শর্তে সমস্যা সমাধানে রাজী হবেন তা অন্য সকলে মেনে নেবেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে এটা বাস্তবসম্মত নয়।

প্রথমদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে (১৯৪৭-এর পর) মনে হোত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে কিছু বৃহত্তর স্বায়ত্বশাসন অনুমোদন করলেই নাগা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সেই পরিস্থিতি আজ আর নেই। বিদ্রোহী জঙ্গি গোষ্ঠী ও তাদের নেতারা অরুণাচল প্রদেশ, অসম এবং মণিপুর রাজ্যের নাগা বসতি আছে এমন সব এলাকাকে একীকরণের অজুহাতে বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ড বা নাগালিম্-এর পক্ষপাতী। অপরপক্ষে অরুণাচল, অসম এবং মণিপুর সরকার তথা ওইসব প্রদেশের সাধারণ জনতা রাজ্যের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে।

এবার শান্তিবার্তায় যোগ দিতে এসে থুঙলাঙ মুইভা হঠাৎ তার জন্মভূমি নাগা অধ্যুষিত মণিপুরের উখরুল জেলার সোমদল-এ ২৩ বছর বাদে যেতে চান বলে ঘোষণা করে দেন। এখানেই ঘোরতর ষড়যন্ত্র টের পায় মণিপুরবাসী অ-নাগা জনসাধারণ। তাদের ধারণা গ্রাম দর্শনের সুযোগে মুইভার আসল উদ্দেশ্য হলো মণিপুরের উখরুল, তামেংলং, সেনাপতি এবং চান্দেল জেলার তাঁর গোষ্ঠীর (হিংস্রতম নাগা জনজাতি গোষ্ঠী-'তাংখুল' নাগা) লোকেদের একত্রিত করা। তারপর ওই এলাকাগুলো গ্রেটার নাগাল্যাণ্ডে যুক্ত করা। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'সাউদার্ন-নাগালিম'। এদিকে মণিপুর রাজ্য মন্ত্রীসভা 'মুইভা'-র মণিপুর প্রবেশের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব পাশ করেছে। নয়াদিল্লীর চাপেও মণিপুরের ক্যাবিনেট মাথা নীচু করেনি। ওদিকে মুইভারও একবগ্গা সিদ্ধান্ত—'ভিজিট অ্যাট এনিকস্ট।'

অপরপক্ষে মণিপুরীদের মৈতেয়ী ও অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠীও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ। তাদেরও স্বাধীন মণিপুর নিয়ে রয়েছে চূড়ান্ত ভাবাবেগ। রয়েছে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী। তাদের মনে ঢুকে আছে ১৯৪৭-এ ঐতিহাসিকভাবে তাদের স্বাধীনতাই লুণ্ঠিত হয়েছে। সেজন্য ভারত সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠেছে বিচ্ছিন্নতাবাদী সক্রিয় জঙ্গি গোষ্ঠী। ছোট প্রদেশে হলেও মণিপুরের মতো এত বেশি সংখ্যক জঙ্গি গোষ্ঠী সম্ভবত ভারতবর্ষের অন্য কোনও রাজ্যেই নেই।

মণিপুর রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্রের কথায়, মুইভাকে মণিপুর (সোমদল গ্রাম) সফরের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যদি তিনি মণিপুরকে ভাগ করার গোপন ষড়যন্ত্র বাতিল করেন। অবশ্য ওই মুখপাত্রটি এও বলেছেন যে, 'মুইভা তার সিদ্ধান্ত আদৌ বাতিল করবেন না। তবে রাজ্য সরকার আন্তঃরাজ্য মণিপুর সীমান্তে যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশ ও সশস্ত্রবাহিনী নিয়োগ করেছে যাতে মুইভা মণিপুরে ঢুকতে না পারেন। মুইভার সমর্থকরা প্রচুর সংখ্যায় জড়ো হয়েছিল। তাদেরকে হঠাতে পুলিশ গুলি পর্যন্ত চালাতে বাধ্য হয়েছে। ফলে কয়েকজন মারা গিয়েছে এবং অনেকে আহত হয়েছে। এই অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য মুইভা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

অপরপক্ষে নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী মুইভাকে মণিপুরে ঢুকতে না দেওয়া এবং পুলিশী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিয়েছেন। অথচ মুইভার সমর্থকদের নাগাল্যাণ্ডে মণিপুরগামী ৫৩নং জাতীয় সড়ক সুদীর্ঘদিন ধরে অবরোধ করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকট ডেকে আনার জন্য কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেননি। এই সংকট থেকে মণিপুরে বসবাসকারী নাগা সম্প্রদায়ও সমানভাবে অসুবিধায় পড়েছেন। আইনের প্রয়োগই করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্র সরকারের উচিৎ অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে নাগাল্যাণ্ড (ডিমাপুর)—ইম্ফল জাতীয় সড়ক সচল করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনা। মণিপুরের নাগা বসতি অধ্যুষিত এলাকা সমানভাবে অবরুদ্ধ। কেন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। মণিপুরবাসীদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে সহায়তা করাটা সরকারের সাংবিধানিক কর্তব্যও বটে।

একই সঙ্গে অরুণাচল ও অসম রাজ্য সরকারের উচিৎ তাদের রাজ্যের এক ইঞ্চি জমিও 'গ্রেটার নাগালিম্'-এ অন্তর্ভুক্তকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। এটাই উপযুক্ত সময়। রাজ্যসরকার, সর্বসাধারণ জনতা এবং রাজ্যগুলির স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানেরও কর্তব্য সদা সতর্ক ও জাগ্রত দৃষ্টি রাখা, যাতে এন এস সি এন জঙ্গিদের সাহায্য নিয়ে কেউ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কোনও এলাকা জবরদখল করতে না পারে।

আর নাগালিম্-এর অলীক, অবাস্তব ও বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা। শান্তিবার্তা যেন অশান্তি সৃষ্টিতে সহায়ক না হয়। স্বচ্ছ, সৎ ও বাস্তব দৃষ্টিতে আলোচনা চালানো উচিৎ। বিপথে পরিচালিত করার অভ্যাস সুস্থ রাজনীতির পক্ষে অভিপ্রেত নয়। নাগা বিদ্রোহীরা নাগা সমাজের সমর্থনের ফলে যে সব দাবী তুলেছে তা নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের এলাকার মধ্যেই সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। পার্শ্ববর্তী কোনও রাজ্যকে কোনওরকম ব্যতিব্যস্ত করা একান্ত অনুচিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কুচবিহারের লাগোয়া কোকরাঝাড় জেলায় যদি অনেক বঙ্গভাষীরা বসবাস করেন তাহলে কি পশ্চিমবঙ্গের কোনও উগ্রপন্থী দল কোকরাঝাড়কে পশ্চিমবঙ্গে সামিলের কথা তুলবে, আর কেন্দ্র সরকার সেই দাবীকে প্রশ্রয় দিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাবে?

[লেখক জে পি রাজখোয়া অসম সরকারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব।
সৌজন্যে ঃ দি সেন্টিনেল]

দারিদ্র্যই মনমোহন-অর্থনীতির বিশেষত্ব

ডঃ জয় দুবাশী

আমাদের বন্ধু যিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রীও—বাস্তবিক অর্থেই একজন অতি সাধারণ মানুষ। সম্প্রতি ইনি সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছেন যে ছোটবেলায় তাঁর পরিবার কত গরীব ছিল, তাঁকে খালি পায়ে দীর্ঘ পাঁচ মাইল হেঁটে স্কুলে যেতে হোত, তাঁকে কেরোসিনের প্রদীপের আলোয় পড়তে হোত—এমনই আরও কত কী। এই সব কাহিনী তিনি কতবার যে বলেছেন তার লেখাজোকা নেই এবং আমরা এর জন্য দুঃখিত।

কিন্তু বক্তব্য হলো, এমনটা অতি সাধারণ ঘটনা। আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে গ্রামের পড়ুয়ারা মাইলের পর মাইল হেঁটেই তাদের স্কুলে যেত। তাই এতে আর নতুনত্বের কী আছে! লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মতো লোকদেরও ছোটবেলায় বই মাথায় করে নদী সাঁতরে পড়তে যেতে হোত; কারণ কোনও সেতু সেই সময় ছিল না। বেশীর ভাগ গ্রামীণ শিশুরা বৈদ্যুতিক আলো চোখে দেখেনি এবং তাদের সবাই পায়ে হেঁটে স্কুল যেত। কাজেই আমাদের বন্ধুবরটি ব্যতিক্রম নন।

কৃষকের আত্মহত্যা।

আমাদের বন্ধুটি যা বলেননি তা হলো—আজও গ্রামের লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ারা পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়, তাদের বাড়ীতে আজও বৈদ্যুতিক আলো পৌঁছায়নি এবং এদের অনেকেরই স্কুল পাঠ্য-পুস্তক কেনার আর্থিক সঙ্গতি নেই। ষাট বছর আগে ভারত বাস্তবিকই একটা গরীব দেশ ছিল—যখন মি. সিং তাঁর গাঁয়ে বড় হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো ভারত আজও গরীব দেশ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও হতদরিদ্র—এদেশে কয়েক দশক কংগ্রেসের রাজত্ব সত্ত্বেও। আগে বেশীরভাগ ছাত্র রাতে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তো এবং আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ তেমনটাই করে। যখন দিল্লী-মুম্বাইয়ে ডঃ সিং-এর বন্ধুরা তাঁরই প্রদর্শিত পথে বাজার অর্থনীতির বদান্যতায় আরও ধনী হয়ে হেলিকপ্টার চড়ছে, তখন অমৃতসরের কাছে তাঁরই নিজের গাঁয়ের শত শত মানুষের কপালে সম্ভবত মোটরগাড়ী চড়ারও সুযোগ হয়নি।

মনমোহন এদেশে একাই গরীব নন। এদেশের রাজা-মহারাজাদের মতো নেহেরু পরিবারের লোকজন তাদের কাপড়-চোপড় পাঠাতো প্যারিসে। কারণ এলাহাবাদে তাদের কাপড়-চোপড় কাচার মতো যোগ্য ধোপা ছিল না। অথচ ডঃ সিং-এর মতো গরীব এক ব্যক্তি এখন নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের সেবা করে চলেছেন। তিনি যে সময়ের তাঁর দারিদ্র্যের কথা বলছেন, সেই সময়ে সম্ভবত এদেশের মানুষদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ছিল পঞ্চাশ টাকা এবং তৎকালে অর্ধ-শিক্ষিত ভারতীয়রা চাইত কোনও মতে ডেপুটি রেজিস্টারের দপ্তরে সামান্য কেরাণীর চাকরি।

কয়েকবছর আগে ডঃ সিং অক্সফোর্ডে গিয়েছিলেন এবং ভাষণে বলেছেন যে, বৃটিশরাই নাকি এদেশে মানুষদের সভ্যতা শিখিয়েছেন। অবশ্যই তা সর্বৈব মিথ্যা। বৃটিশরা এদেশকে দুর্ভিক্ষ, বুভুক্ষা, সীমাহীন দারিদ্র্য এবং অসহায়তা ছাড়া আর কিছুই উপহার দেয়নি। বৃটিশদের ২০০ বছর রাজত্বের পর আমরা সাদা চামড়াদের দৈহিক, মানসিক দাসে পরিণত হয়েছি। ডঃ সিং বৃটেনের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে, বৃটিশরাই আমাদের প্রাচীন সভ্যতা থেকে মুক্ত করে নিজেদের সভ্যতা শিখিয়েছে। এমন মনোভাব কেবলমাত্র আমাদের দেখিয়ে দেয় যে বৃটিশরা কেমনভাবে ডঃ সিং-এর মগজধোলাই করেছে।

মনে হয় ডঃ সিং ভাবতে শুরু করেছেন যে, গরীবি ধারণাটাই ইতিহাসে বিলীন এবং ভারত আর এখন গরীব দেশ নয়। এখানকার শিশুরা ভরাপেটেই শুতে যায়, বাটার নতুন জুতো পরে স্কুলে যায় এবং সেইসঙ্গে নতুন ইউনিফর্ম পরে। যদি এমনটাই তাঁর ধারণা হয়ে থাকে তো তিনি সবকিছুই ভাবতে পারেন। ভারত আজও গরীব দেশ এবং এর দায় ডঃ সিং-এর মতো লোকেদের ওপর বর্তায়।

যেখানে আমেরিকা এবং ইউরোপের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৫০,০০০ ডলার সেখানে ভারতের মাত্র হাজার ডলার এবং এর অর্থ হলো প্রতিদিন তিন ডলার। বিশ্ব ব্যাংকের মতে এই অর্থে কেবলমাত্র বেঁচে থাকা যায়। স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও দেশ দারিদ্র্যের বোঝা বয়ে নিয়েই চলছে এবং মনমোহনের মতো মানুষই আমাদের অর্থনীতির সঞ্চালক। পরিণামে দেশের কৃষকরা আত্মহত্যা করেছেন এবং সিং অ্যাণ্ড কোং বলছে এতে তাদের কোনও কিছুই করার নেই। কৃষিমন্ত্রী শারদ পাওয়ারের বন্ধুরা ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছে। এদের মতে চড়া দাম নাকি উন্নয়নের লক্ষণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকরা বছরের পর বছর আত্মবলিদান দিচ্ছে কারণ তাদের ধার শোধ করার ক্ষমতা নেই। এমনকী তাদের পরিবার চালানোর মতোও সঙ্গতি নেই।

গরীবিই বৃটিশ রাজত্বের বিশেষত্ব এবং ডঃ সিং-য়েরা এই বৃটিশ শিক্ষার উৎপন্ন ফসল। গত বিশ্বযুদ্ধের আগে বৃটেনের অর্ধেক মানুষ গরীব ছিল যদিও সেই সময়ে বৃটেন উন্নতির শিখরে। জর্জ অরওয়েল যিনি "অ্যানিম্যাল ফরম" ও "১৯৮৪" পুস্তক দুটির প্রণেতা, তিনি নিজেই ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অবাক হবার মতো কিছু নেই যে, তাঁর জন্ম ভারতেই। তিনি সাংবাদিক তাই তাঁকে বৃটেনের খনি শহর ওয়েলেসে পাঠানো হলো সংবাদ সংগ্রহের কাজে। আর এই সূত্রে তিনি 'The Road to Wigan Pier' নামে একটা বিখ্যাত বই লিখে ফেললেন যাতে কয়লা খনির শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। এইসময়ে বৃটেন ছিল উন্নতির শিখরে অথচ প্রদীপের নীচে আঁধারের মতোই শ্রমিকেরা মাছির মতো মরছে যক্ষ্মা আর নিউমোনিয়ায়। বৃটিশরা তাদের লোকজনদের গরীব বানিয়ে রাখাটাকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে নিয়ে গেছিল এবং মনে হয় ডঃ সিং-রা তাদেরই দেশে প্রশিক্ষিত এবং বিশেষতঃ জওহরলাল নেহরু এই বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত। যদি আপনি সিং অ্যান্ড কোং-এর মতো মনে করে থাকেন যে ভারতে কোনও গরীবিয়ানা নেই, তাহলে আপনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, দূর করা তো দূর অস্ত। এই জন্যই কৃষক আত্মহত্যাকে সেভাবে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। সিং অ্যান্ড কোং-এর কাছে কৃষক বলে কোনও সম্প্রদায়ই নেই। এরা হলো আবর্জনা, সুতরাং এদের উপেক্ষা করো।

সরকার তার মন্ত্রী, আমলাদের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচা করলেও মাত্র কয়েক হাজার টাকাও খরচ করছে না দরিদ্র পরিবার ও তাদের ছেলেমেয়েদের কল্যাণে। মহারাষ্ট্রে সরকারি হিসেবে মতে মন্ত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে পয়সার যোগান দেওয়া গেলেও গ্রামে স্কুল গড়ার পয়সা নেই। আমাদের অর্থনীতির মডেল হলো ধনীদের আরও ধনী করা, গরীবদের আরও গরীব করা। আমরা যেসব দেশ থেকে ধার নিই সেসব দেশও একই মডেলে দেশ চালাচ্ছে। ধনী দরিদ্রের মধ্যে ফারাক বেড়েছে যখন সিং অ্যান্ড কোং ক্ষমতায় এসে অর্থনীতিকে বিশ্বায়ন করল। দুনিয়ার অন্য দেশেও একই ঘটনা ঘটলো। তারা নিজেদের অর্থনীতির দুয়ার খুলে দিলো। এই মডেলের ফল হলো ভারতে আরও বেশী বিদেশী সংস্থার বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং এরা আমাদের দেশীয় শিল্পকে কবজা করে ফেলল। বিশ্বায়নের নামে আমরা আমাদের দেশকে বিদেশীদের হাতে তুলে দিলাম। এটাই ছিল সম্ভবত মুক্ত অর্থনীতির প্রথম শর্ত। বিশ্বায়ন এবং মুক্ত বাজার সত্ত্বেও সম্ভবত এদের জন্য ভারত এখনও বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ এবং আজও এদেশের মানুষ দুনিয়ার দ্ররিদ্রতম বলে গণ্য হয়—সিং অ্যান্ড কোং পাঞ্জাবের শিশুদের যাই বোঝাক না কেন।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

বর্ষপূর্তিতে ইউ পি এ সরকা

শুধু সন্ত্রাসবাদ নয়, মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সন্ত্রাস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ইউ পি এ সরকারের ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি কিংবা দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি, গত বাইশে মে-কে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন—মমতার সংযোজন কিংবা সিপিএমের বিয়োজন, তাতে আপাদমস্তক ইউ পি এ সরকারের অপদার্থতার মাপকাঠির বিশেষ হের-ফের হওয়ার কথা নয়। হাজারো অপদার্থতার মাঝে বেশ কিছুদিন আগে বোম্বে হাইকোর্টে সাজাপ্রাপ্ত ২৬।১১-এর আসামি আজমল কাসভের ফাঁসির আদেশকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারি অপদার্থতা সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে। কারণ কোনও হাইকোর্ট কিংবা নিম্ন আদালত ফাঁসির হুকুম দিলেই ফাঁসি কার্যকর হয়ে যায় না। আসামী ধাপে ধাপে সুপ্রিম কোর্ট অবধি সেই ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টেও তা নামঞ্জুর হলে শেষ সুযোগ থাকছে যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চাওয়ার। এই প্রাণ-ভিক্ষা দেবার জন্য ভারতবর্ষের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে অনন্তকাল সুযোগ দিয়েছে। ফাঁসি নামক মৃত্যুদণ্ডটির অপরিহার্যতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে বিশ্বের দরবারে। প্রথম বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ফাঁসি নিষিদ্ধ করে ক্লেশহীন মৃত্যুদণ্ডের (মূলত ইঞ্জেকশানের মাধ্যমে বিষপ্রয়োগ করে) ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা মানতে চান না অনেকেই। চরম শাস্তি হিসেবে আজীবন কারাদণ্ডের পক্ষে সওয়াল করছে বিশ্বের অনেকগুলি দেশ।

সভ্যদেশে ফাঁসি কতটা মানানসই এনিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রশ্নের ঝড় উঠলেও সন্ত্রাসবাদী এবং সেইসাথে দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চরমতম শাস্তি গ্রহণের পক্ষেই সওয়াল করেছে আপামর বিশ্বে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা উঠে আসছে ঠিক এখানেই। সাম্প্রতিক দু'টো প্রমাণ আমরা দিতেই পারি। ১৩ ডিসেম্বর ২০০১-এ সংসদ ভবন হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আফজল গুরু এবং সেইসাথে সৌকত হুসেন গুরুর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয় ২০০৫ সালে। নিম্ন আদালতের এই আদেশকে দিল্লী হাইকোর্ট বজায় রেখে দিলে আসামীরা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। সুপ্রিম কোর্ট ২০০৫-এর ৪ আগস্ট সৌকত হুসেনকে ছেড়ে দিলেও বহাল রাখে আফজল গুরুর সাজা। ২০০৬-এ আফজল বাঁচার শেষ ভরসা হিসেবে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করে ভারতের মহামহিম রাষ্ট্রপতির কাছে। কিন্তু মন্ত্রিসভার অনুমোদন ব্যতীত কিছু করার উপায় নেই রাষ্ট্রপতির। তাঁর ভূমিকাটা এখানে ঠুঁটো জগন্নাথের মতোই। দিল্লীর কংগ্রেসী সরকার কোনও অদৃশ্য কারণে (মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক?) ঝুলিয়ে

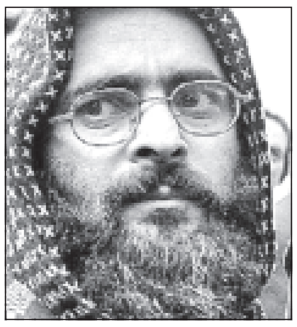

আফজল গুরু,

আফতাব আনসারি,

ইউপিএ সরকারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বর্ষপূর্তি

পূর্তিতে ইউ পি এ সরকার।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দ্বিতীয় দফার ইউ পি এ সরকারের বর্ষপূর্তি সম্প্রতি পূর্ণ হলো। ২০০৪-এ এন ডি এ জোটকে হঠিয়ে দিয়ে যে জোট সরকার কংগ্রেস (সোনিয়া) দলের নেতৃত্বে ও বামপন্থীদের সমর্থনে প্রথম দফায় ক্ষমতায় এসেছিল এবং নিজেদেরকে 'আম আদমীর সরকার' বিশেষণে ভূষিত করেছিল, তারা কি 'আম আদমী'র প্রাথমিক প্রত্যাশাও পূরণ করতে পেরেছে? গত এক বছরে ইউপিএ সরকারের কাজকর্মের খতিয়ানটা দেখলেই এর উত্তর মিলবে। এবং সেটা যে নেতিবাচক তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। এন ডি এ-জমানার তুলনায় দ্বিগুণ-তিনগুণ। একথা আজ কারও পক্ষেই অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। ভোগ্যপণ্যের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের, মায় শাক-সবজির দামও বহুগুণ বেড়েছে। এই ব্যাপক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পুরো বোঝাটা চেপেছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। দিল্লীর নাগরিকরাও এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির রোষ থেকে রেহাই পায়নি। যদিও এদেশের আম-আদমী ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে দিল্লীতে শীলা দীক্ষিত সরকারকে হ্যাটট্রিক করার সুযোগ দিয়েছে।

যখনই নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, তখনই সরকার পক্ষের জবাব—"আমরা মনিটরিং করছি।" মানে দেখছি। অথচ বাস্তবে বিস্তর ফারাক। বাজারে গেলেই ধরা পড়ে যায় সরকার পক্ষের স্তোকবাক্য নিষ্ফলা উপদেশ-বাণীমাত্র। চিনি এবং শাকসবজির দাম যে হারে বেড়েছে তাতে গৃহস্থের কাছে বাজেট ঠিকঠাক রাখাটা এক মস্তবড় চ্যালেঞ্জ। দক্ষিণ দিল্লীর বাজারে জনৈকা গৃহবধূর মুখে এরকমই মন্তব্য শোনা গেল। আলুর দামও ১৫-২০ টাকা উঠেছে। বিগত একবছরে চক্রবৃদ্ধি হারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। শাকসবজি, ফলমূল, চা-চিনি সবেরই দাম বেড়েছে। কিছুদিন আগে সাফসাফ জানিয়ে দিয়েছেন—কেন্দ্রীয় খাদ্য ও রসায়ণ মন্ত্রী শারদ পাওয়ার। তিনি জনতা-জনার্দনকে উদ্দেশ্য করে বাণী বিতরণ করেছেন—"১৫/২০ টাকা কিলো চিনির আশা চিরতরে ভুলে যান।" অথচ—এন ডি এ জমানায় চিনির দাম ১৭ টাকা কিলো ছিল। ২০০৯-এর মে মাসেও অড়হর ডালের দাম ছিল—৫৫-৬০ টাকা কিলো। এখন তা ৮০/৯০ টাকা। মুগ ডালের দাম তখন ছিল ৪০/৪৫ টাকা। বর্তমানে ৭৫-৮৫ টাকা। মুসুর ডাল ছিল ৪৫/৫০ টাকা কিলো—বর্তমানে ৭০ টাকা। চিনির দামও ২০০৮/০৯-এ ২৪-২৬ টাকা কিলো, বর্তমানে ৩৫/৪০ টাকা। দুধের দাম লিটার প্রতি ২০/২২ থেকে বেড়ে ২৮/৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। সাধারণ ঘি-র দামও ১৬০ টাকা থেকে বেড়ে ২৬০ টাকা কেজি। পেঁয়াজের দামও ৮/১০ থেকে ১৫ তে গিয়ে ঠেকেছে। সবুজ টাটকা শাক-সবজিও কিলোপ্রতি ২০/২৪ টাকার কমে পাওয়া যায় না। দেশের সর্বত্রই এখনকার এটাই বাজার দর। ফারাকটা উনিশ-বিশ।

রাজ্য সরকারগুলো দাম নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। এরাজ্যে যেমন কম দামে আলু বিক্রির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার খুলে আটা ও অন্যান্য মুদিখানার জিনিসপত্র ভর্তুকি দিয়ে কম দামে বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছিল। "কিন্তু রোজই যদি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ে, তাহলে বাঁচব কিভাবে?" —দিল্লীর এক দোকানীর এই খেদোক্তিই বুঝিয়ে দেয় অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন সরকারি চাকুরের কথায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ঘটনা হলো বাজারে জিনিসপত্রের যে অভাব আছে তা নয়। অথচ অর্থনীতির সূত্রকে পাত্তা না দিয়ে দাম বেড়েই চলেছে। দাম একবার বাড়লে আর কমে না। দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও সরকার কাজের কাজ করছেন না। বাস্তবে কিছু করা হচ্ছে না। তাদের মতে নাকি এই দাম বৃদ্ধি উন্নতির সূচক। বাজার অর্থনীতির এটাই নাকি বৈশিষ্ট্য। এরপর আবার পেট্রলের দামবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ভোগান্তি নতুন করে বাড়িয়েছে। মে ২০০৯-এ পেট্রল ৪০ টাকা ৬২ পয়সা, ডিজেল ৩০ টাকা ৮৫ পয়সা ছিল। কিন্তু এখন পেট্রল ৪৭ টাকা ৯৩ পয়সা, ডিজেল ৩৮ টাকা ১০ পয়সা। প্রসঙ্গত, প্রত্যেক মেট্রো শহরে পেট্রল-ডিজেলের দামে ফারাক থাকে নীতিগত কারণে। গত বছর সি এন জি-এর দাম ছিল ১৬ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম, এবছর ২১ টাকা ১০ পয়সা কিলো। এছাড়া রাজধানীতে সি এন জি-র দাম প্রতি কিলোতে কুড়ি শতাংশ বাড়ার কথা।

কেন্দ্রে বিরোধী দল, ভারতীয় জনতা পার্টি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। তারা গত ২৪ মে দিল্লীতে যন্তরমন্তর-এ ধর্না ও কালাদিবস পালন করেছে। ২১ এপ্রিল রাজধানীতে বিশাল সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বনধ্ পালিত হয়েছে।

পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে সরকারকে তুলোধুনা করছেন লোকসভার বিরোধী দলনেত্রী সুষমা সরাজ এবং অরুণ জেটলি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। আসলে সরকারের মন্ত্রী আমলাদের তো দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিতে কিছু যায় আসে না। কেননা, কেন্দ্রের মনমোহন মন্ত্রীসভার ৭৯ জন মন্ত্রীর ৪৭ জনই কোটিপতি। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার যেমন ডি পূরণদেশ্বরী, প্রফুল্ল প্যাটেলের মতো মন্ত্রীরা শতকোটি, হাজার কোটির মালিক। চাল-ডাল-নুন-তেলের দাম বাড়ালে এদের কিছু যায় আসে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বোঝা আমজনতার পিঠটাকেই শুধু নুইয়ে দেয়।

দ্রবমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নেমেছন মহিলারা।

ঊর্ধ্বমুখী দ্রব্যমূল্য

জিনিসপত্র	দাম-মে-২০০৯	দাম-মে-২০১০
আলু	৬-৮ টাকা-প্রতি কেজি	১০-১৪ টাকা প্রতি কেজি
অড়হর ডাল	৫৫-৬০ টাকা প্রতি কেজি	৮০-৯০ টাকা প্রতি কেজি
মুগ ডাল	৪০-৪৫ টাকা প্রতি কেজি	৭৫-৮৫ টাকা প্রতি কেজি
দুধ	২২ টাকা প্রতি লিটার	২৮-৩০ টাকা প্রতি লিটার
ঘি	১৬০ টাকা প্রতি কেজি	২৬০ টাকা প্রতি কেজি
চিনি	২৪-২৬ টাকা প্রতি কেজি	৩৮-৪২ টাকা প্রতি কেজি

াপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের ফাঁসিতে ঝোলাতেও ব্যর্থ

রেখেছে আফজলের সাজা। কলকাতায় মার্কিন দূতাবাসে হানায় যুক্ত আফতাব আনসারির ফাঁসির শাস্তিও ঠিক একইভাবে ঝুলে রয়েছে। আফজল, আফতাব কিংবা কাসভ-এর মৃত্যুদণ্ড যত শীঘ্র সম্ভব কার্যকরী করা দরকার। কারণ এরা যেমন একদিকে বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তেমনি বহু মানুষকে মেরেও এদের মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা পরিলক্ষিত হয়নি। তাই ভবিষ্যতে আরও মানুষ খুন করতে এদের হাত বিন্দুমাত্র কাঁপবে না।

আফতাব আনসারি,

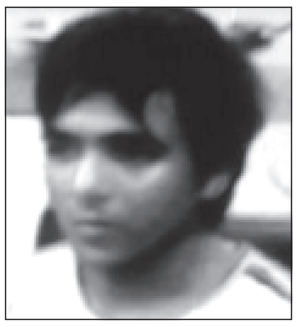

আজমল কাসভ

* * *

অপরাধীদের ফাঁসি নিয়ে টালবাহানা

কিন্তু দেশদ্রোহিতা এবং এই-সংক্রান্ত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ছাড়াও বহু অপরাধ রয়েছে যার জন্য আদালত ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। এই ফাঁসি সংক্রান্ত তথ্য-পরিসংখ্যানগুলো একটু দেখে নেওয়া যাক।

গত দু'দশকে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো প্রাণভিক্ষার মোট চারটি আবেদনে সাড়া দেন রাষ্ট্রপতি, খারিজ করে দেন বাকি নটি। একইভাবে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯—এই দশ বছরে ৪৫টি প্রাণভিক্ষার আবেদনের মধ্যে ৪টি ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবনের আদেশ দেন রাষ্ট্রপতি। বাকি ৪১টি আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এখনও পর্যন্ত ২৫৬ জন ব্যক্তির ফাঁসির আদেশ হয়েছে নিম্ন-কোর্টে। এর মধ্যে বহু লোকের উচ্চতর আদালতে করা 'আপিল' ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে।

২০০৯-এ লোকসভায় দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মুল্লাপল্লী রামচন্দ্রন জবাবী প্রশ্নের উত্তরে জানান—২০০৭-এর ৩১ ডিসেম্বর অবধি ৩০৮ জন ফাঁসির আসামী দেশের বিভিন্ন জেলে রয়েছেন। এর মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে ৫২টি আবেদন জমা পড়েছে। এই ক্ষেত্রে ২৬।১১-এ অভিযুক্ত আজমল কাসভ হলেন ৩০৯ নম্বর ব্যক্তি। এই 'লিস্টে' মহিলার সংখ্যা ৬ (এর মধ্যে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত নলিনীও আছেন। যার প্রাণভিক্ষার আবেদন ২০০৫-এর ২১ জুন খারিজ হয়ে যায়)। এর মধ্যে সর্বাগ্রে বিহার—৮০ জন ফাঁসির আসামি রয়েছেন সেখানে। এরপরই উত্তরপ্রদেশ, সেখানে সংখ্যাটা ৭২। ২০০৪-এর ১৪ আগস্ট হেতাল পারেখকে খুনের ঘটনায় ফাঁসি হয় ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের। সেটাই আপাতত শেষ ফাঁসি। এ বছরের গোড়াতেই ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত তিন আসামী তামিলনাডুর আর গোবিন্দস্বামী এবং উত্তরপ্রদেশের ধর্মেন্দ্র কুমার ও নরেন্দ্র যাদবের শাস্তি কমিয়ে যাবজ্জীবনের বন্দোবস্ত করেন কেন্দ্রীয় সরকারের বকলমে রাষ্ট্রপতি। জীবন-মরণের মুখোমুখি দাঁড়ানো এই খেলা বন্ধে কি সক্রিয় হতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকার?

চিঠিপত্র

জব কার্ড

একশোদিনের কাজের প্রকল্পে কেন্দ্রের দেওয়া টাকা রাজ্যে নিয়মমতো খরচ হচ্ছে না একথা অনস্বীকার্য। অর্থাৎ রাজ্যের সাধারণ মানুষকে সরকারি গাফিলতিতে তাদের প্রাপ্য অর্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। অথচ নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্যে এই প্রকল্পের কাজ হলে জবকার্ড পাওয়া রাজ্যের সাধারণ মানুষ আর্থিক সহায়তা পেতেন। সেই সঙ্গে রাজ্যে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের অগ্রগতি হোত। আসলে এ রাজ্যে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে রাজনীতির খেলা চলছে। মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প হলেও গ্রামাঞ্চলে লালঝান্ডা লাগিয়ে জবকার্ডধারীদের কাজ করানোর অর্থ কি? জবকার্ড একটি ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার। এরসঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলেরই সম্পর্ক থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু অনেক জবকার্ডধারীকেই লালঝান্ডা হাতে নিয়ে মিটিং মিছিলে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রাপ্য অর্থ না দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধারণ জবকার্ডধারী নারী পুরুষেরা রাজনীতির ছত্রছায়ায় আসতে বাধ্য হচ্ছেন। জবকার্ডধারীদের সঙ্গে প্রতারণা করে অর্থ পকেটস্থ করার ঘটনাও ঘটে চলেছে। এমনিতেই এই প্রকল্পে অর্থের অপচয় নতুন কিছু বিষয় নয়। তদন্তসাপেক্ষে অর্থের হিসেবের অনেক গরমিল খুঁজে পেলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এরাজ্য এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রেও অনেক পিছিয়ে আছে। মূলতঃ পরিকল্পনার অভাব, পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব গয়ংগচ্ছ মনোভাবের জন্যই এরাজ্যে কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। তাছাড়া যেখানে লালপার্টির সমর্থকেরা অনেকেই জবকার্ড পেয়েছেন সেখানে অনেকক্ষেত্রেই বিরোধী দলের অথবা সাধারণ মানুষ এই সরকারি জবকার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অর্থাৎ একশো দিনের কাজের প্রকল্পে প্রশাসনকে হাতিয়ার করেই সাধারণ মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের কৌশল অবলম্বন করে চলেছে একশ্রেণীর নেতা নেত্রীরা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, একটা সরকারী কাজের প্রকল্পে রাজনীতির প্রবেশ কতটা ন্যায়সঙ্গত? রাজ্যে নিরপেক্ষভাবে জবকার্ড বিতরণ করা হয়েছে কি? জবকার্ডধারী সাধারণ মানুষ তাদের প্রাপ্য অর্থ নিয়মমাফিক পাচ্ছেন কি? সর্বোপরি একশোদিনের কাজের প্রকল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য এরাজ্যে কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে ও তার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেন কি তথাকথিত সর্বহারার নেতা নেত্রীরা? আসলে নৈরাজ্যের রাজ্যে দুর্নীতি গ্রাস করেছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাই উন্নয়নের নামে দলীয় স্বার্থসিদ্ধি অত্যাশ্চর্য কোনও ঘটনা নয়।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

জোট প্রহসন

পুরসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের মানুষ কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জোটের নামে প্রহসন প্রত্যক্ষ করলেন।

একটি জোটকে সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে যে আন্তরিকতার প্রয়োজন তা কংগ্রেস এবং তৃণমূল কোনও দলেরই ছিল না। প্রথমত বলা যেতে পারে, কংগ্রেস দলটির কথা। সেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল, সবাই সেখানে স্বঘোষিত নেতা, কেউ কাউকে মানে না। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার নেতা-নেত্রীই সেখানে বেশি। তাই এহেন দলের কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই।

অপরপক্ষে তৃণমূল দলটি দাঁড়িয়ে আছে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমির উপর। সেখানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত শব্দটি নিতান্তই অলীক। তাই পুরসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে জোটের যা ভবিতব্য ছিল তাই হয়েছে।

মাননীয় রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ইউ পি এ সরকারের সম্পর্কে যে উক্তি করতেন (দিল্লিতে দোস্তি আর কলকাতায় কুস্তি) তা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে নিজের কাছে।

তাই এই জোট শুধু পুরসভা নির্বাচনেই নয়, আগামী ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনেও যে নিষ্ফলা হবে তা জোর দিয়ে বলা যায়।

—সুশান্ত কুমার দে, গ্রিন পার্ক, কলকাতা।

সিপিএমের নতুন প্রার্থী

সিপিএম এবারের পুরনির্বাচনে প্রচুর নতুন মুখকে প্রার্থী করেছে এবং এ ব্যাপারে বেশ আত্মসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছে। কিন্তু কেন? বর্তমান সদস্যরা তবে কী দোষ করেছেন? তাঁদের কেনই বা বাদ দেওয়া হলো? জানি, সিপিএমের কাছে এসব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া অসম্ভব। তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সিপিএম থেকে নির্বাচিত বর্তমান পুরসদস্যদের অধিকাংশই দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত। তাদের ঘটেছে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। অনেকে হয়েছেন 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'। তাঁরা নাগরিক পরিষেবা দিতেও হয়েছেন ব্যর্থ। পুরবাসীদের কাছে এসব অজানা নয়। কারণ তাঁরা যথেষ্ট সচেতন নাগরিক। তাই সিপিএম-নেতৃবৃন্দ কোনওরূপ ঝুঁকি না নিয়ে অধিকাংশ নির্বাচিত সদস্যকে বাদ দিয়ে তাঁদের জায়গায় এবার মনোনয়ন দিয়েছেন নতুনদের—কোনও কোনও সদস্যকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্য ওয়ার্ডে। কিন্তু সিপিএম যে চালাকির আশ্রয় নিয়েছে তাতে কী কোনও মহৎ কাজ সাধিত হবে? সম্ভব হবে কী 'নির্বাচনী বৈতরণী' পার হওয়া তাদের পক্ষে? সিপিএম যদি মনে করে থাকে যে জনগণ বোকা, আত্মভোলা, তাঁদের চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব তাহলে তারা ভুল করবে। 'পরিবর্তনের হাওয়া'য় জনগণ কিন্তু এবার সিপিএম সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক। তাছাড়া সিপিএমের নতুনরা যে তাঁদের পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করবেন না তারই বা গ্যারান্টি কী?

প্রত্যেক পুরবাসীই পুরপ্রশাসন ও সরকারের কাছে আশা করেন উন্নত পুর পরিষেবা, যেমন ঃ রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি। কিন্তু পুরবাসীরা তাঁদের কাঙ্ক্ষিত পরিষেবা পাচ্ছেন না। বরং তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন রয়ে গেছেন সেই তিমিরেই।

তাই এহেন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে শাসকদল পুরবাসীদের কাছে পুরনির্বাচনে ভোট চায় কোনও অধিকারে? কোন্ মুখে? তাদের জানা উচিত, শাক দিয়ে যেমন মাছ ঢাকা যায় না তেমনি চালাকির দ্বারাও মহৎ কাজ হয় না।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

চতুর্যুগ ও সৃষ্টিচক্র

চৈতালী চন্দ 'জন্ম মৃত্যুর চক্র' শীর্ষক রচনায় (স্বস্তিকা, ২৬।৪।১০) "ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়" থেকে সঞ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চার যুগ নিয়ে ৫,০০০ বছর কালপরিমাণযুক্ত এক সৃষ্টিচক্রের কথা বলেছেন;জানিয়েছেন, উক্ত প্রত্যেকটি যুগের মেয়াদ ১২৫০ বছর। কিন্তু সূর্যসিদ্ধান্ত সূত্রে আমরা জানি, যুগগুলির বিস্তার সমান নয়। কলিযুগের বিস্তার ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বছর;দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্যযুগের বিস্তার যথাক্রমে কলিযুগের দ্বিগুণ, তিনগুণ ও চতুর্গুণ। সুতরাং, যুগচতুষ্টয়ের সর্বসাকুল্যে বিস্তার ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছর। অর্থাৎ, ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছর অন্তর নতুন করে যুগচক্রের সূচনা হয়। অন্যদিকে, সহস্র চতুর্যুগ, তথা ৪৩২ কোটি বছরে ব্রহ্মার ১ দিন। ব্রহ্মার রাত্রিও সমপরিমাণ। দিবাভাগে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় ও বিদ্যমান থাকে; রাত্রিতে লয় পায়। অর্থাৎ, লেখিকা-কথিত ৫ হাজার বছর মেয়াদী ১ চতুর্যুগ নয়, সহস্র চতুর্যুগ, তথা ৪৩২ কোটি বছর অন্তর সৃষ্টিচক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে। গীতাতেও (৮।১৭) তা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 'কল্যব্দ' শীর্ষক বিজ্ঞান-ভিত্তিক নিবন্ধে (স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা ১৪০৫) ওই বিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করেছেন। উপসংহারে কতিপয় জিজ্ঞাসা। (এক), লেখিকা উল্লেখিত "ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়" বিষয়টি বোধগম্য নয়। ওটা কি বাস্তব না অনুভূত কোনও কিছু? (দুই), রচনাটিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে আমরা 'সঙ্গমযুগে' আছি। কিন্তু হিন্দু, তথা ভারতীয় কালগণনা পদ্ধতিতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি—এই যুগচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত কোনও যুগের অস্তিত্ব নেই। (তিন), লেখিকা বলেছেন, কলিযুগে আমরা ৪২ বার জন্ম নেবো। তাঁর উল্লেখিত কলিযুগের মেয়াদ ১২৫০ বছর। মৃত্যুর কতদিন পর পর আমাদের পুনর্জন্ম হবে, তার কোনও স্থিরতা নেই।

যদি মৃত্যুর কম-বেশি ১ বছর পর পুনর্জন্ম হবে বলে ধরে নিই, তাহলে, বর্তমানকালে আমাদের জীবনকালের গড় হবে ২৮ বছরের মতো। বাস্তব কি তা বলে?

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা।

জনমত

কাশ্মীরের আজাদি

কিরণশঙ্কর মৈত্র

কর্মসূত্রে জম্মু-কাশ্মীরে তিন বছরের বেশী সময় থাকাকালীন, ভূস্বর্গের নয়নাভিরাম শ্যামলিম পর্বতশ্রেণী, প্রস্ফুটিত কমলপুষ্প শোভিত অপরূপ ঝিল, চিত্রপ্রতিম চিনার বৃক্ষরাজি, সবুজ আপেলের বাগান এবং বিভিন্ন সৌন্দর্যের সমাহারে কাশ্মীরকে মনে হয়েছে একটি ঊষর মরুভূমির সমান। শ্রীনগরের রাস্তায় চলতে গিয়ে চোখে পড়েছে স্থানীয় যুবকদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী মনোভাব। জিনিষপত্র কিনতে গেলে স্থানীয় বিক্রেতাদের কাছে দ্রব্য মূল্যের তিনটি স্তর ঃ প্রথমত, কাশ্মীরী মুসলমান দোকানদারের কাছে কোনও মুসলমান কোনও জিনিষ কিনতে গেলে তার দাম এক রকম, দ্বিতীয়ত, সেই একই জিনিষ কোনও অমুসলমান কিনতে গেলে অন্য রকম দাম এবং তৃতীয়ত, বহিরাগত কোনও অমুসলমান ক্রেতার কাছে তার দাম সর্বাধিক। শ্রীনগরে যখনই কোনও কিছু কিনতে গেছি সব সময় আমার কাশ্মীরী মুসলমান অফিসারদের সাহায্য নিয়েছি।

জম্মু-কাশ্মীরে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পরে সুবিখ্যাত 'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকার প্রতিবেদক মন্তব্য করেছেন—"অনেক কাশ্মীরীই গভীরভাবে ভারতের মধ্যে থাকায় অসন্তুষ্ট। যদি তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া হয় (যেমন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তা তাদের দেওয়া হবে) তারা সম্ভবত ভোট দেবে আলাদা হয়ে যাবার জন্যে।"

'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকার সাংবাদিক জানিয়েছেন—সেই সময়ে একটি ভারতীয় মিলিটারি কনভয় সেখান থেকে যাবার সময়ে কীভাবে স্থানীয় যুবকেরা তার দিকে মাটি পাথর ছুঁড়ে মারছিল ক্রুদ্ধ সব 'আজাদি' ধ্বনি দিতে দিতে।

ভুল ধারণাভিত্তিক এইসব মিথ্যা রিপোর্টের ত্বরিৎ প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কারণ এইসব মিথ্যা ভাষণ অমৃতসমান গলাধঃকরণ করে, উপভোগ করে কিছু পশ্চিমের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক দুনিয়া এবং কতিপয় সেকুলারিস্ট ভারতীয় এবং বহু কাশ্মীর ভ্যালি-অধিবাসীরা।

নির্মোহ দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক পশ্চাদপটের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। জম্মু ও কাশ্মীরে যাট বছর আগে ভারত সরকার গণভোট (প্লেবিসিট) করতে চেয়েছিল যেমন হয়েছিল গুজরাটের জুনাগড়ে। জুনাগড়ের শাসক ছিলেন মুসলমান, কিন্তু অধিকাংশ প্রজাসাধারণ হিন্দু। ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট জুনাগড়ের নবাব প্রজাসাধারণের মতামত না-জেনেই পাকিস্তানে যোগদান করেন। ফলে, ভারতীয় সেনাকে সেখানে প্রবেশ করতে হয়। তারপর ভারত তার কার্যবিধির বৈধতা অনুমোদন-নিশ্চিত করার জন্য সেখানে গণভোট অনুষ্ঠিত করে। বিস্ময়কর বিপুল সংখ্যাধিক্যে জনসাধারণ ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির সপক্ষে ভোট দেন।

জম্মু-কাশ্মীরের চিত্র অন্যরকম। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরের শেষে কাশ্মীরের হিন্দু মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগদান করেন যেখানে তার প্রজাসাধারণের বেশির ভাগ মুসলমান। পাকিস্তান এর তীব্র প্রতিবাদ করে। প্রতিবাদ দুই দেশের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়। ১৯৪৮ সালের প্রথমে বিবাদটি ইউনাইটেড নেশনস্-এ পেশ করা হয় জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে, যিনি গণভোট করতে চান কাশ্মীরী জনসাধারণের মতামত জানবার জন্যে।

নেহরুর এই প্রয়াসের জন্যে হিন্দু-জাতীয়তাবাদীরা তার সমালোচনা করতে থাকেন। তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হলো জুনাগড়ে বল্লভভাই প্যাটেল একই ধরনের প্রস্তাব দেবার পরে এছাড়া অন্য উপায় ছিল না। গণতন্ত্রের উদার আসনে পদক্ষেপের সূচনায় নতুন রাষ্ট্র ভারতকে আইনের শাসনকে মেনে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতকে মান্যতা দিয়ে এটা করা আবশ্যিক ছিল।

গণভোটের পূর্ব শর্ত ছিল কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান-অধিকৃত ছিল সেখান থেকে সৈন্যাপসারণ। অন্যপক্ষে, পাকিস্তানের বক্তব্য যে ভারতীয় কাশ্মীরের যে অংশ যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যাশনাল কনফারেন্সের শাসনাধীন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও 'ফ্রি বা ফেয়ার' ('free or fair') নির্বাচন-ভোটদান সম্ভব নয়। দুটি পক্ষই আপন আপন মতে অবিচল থাকায় অচলাবস্থা অব্যাহত থাকে। অনেক ইউ এন মিশন এলো এবং গেল, কিন্তু অবস্থা অপরিবর্তিত। ১৯৫০ সালের প্রথমে, অবস্থা অনুধাবন করে নেহরু তার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি—গণভোট থেকে সরে আসেন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনুধ্যান করা যায় যে গণভোট হলে তখন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে হয় ভারত অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে হতো, কোনও তৃতীয় বিকল্প ছিল না। এই নীতি মনে রেখে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলির ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবার বিকল্প ছিল।

'দ্য ইকনমিস্ট'-এর মতো আরও একাধিক পাশ্চাত্য (দুয়েকজন ভারতীয়-ও) সাংবাদিক যখন এই বিষয়ের উপরে নিবন্ধ বা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন—তারা কেউ কেউ তৃতীয় বিকল্পের কথা বলেন—যেন তৃতীয় বিকল্প ছিল বা আছে। আইনানুগ ভাবে ভারত থেকে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্ন হওয়া বা কাশ্মীরের তথাকথিত 'আজাদি' অসম্ভব। সামরিক শক্তির সাহায্যেও তা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কথা অনেকের মনে আসতে পারে। এটি বাস্তব সত্য যে ১৯৭১ সালে পাক-সেনার যে শক্তি ছিল, ২০০৯ সালে ভারতের সামরিক শক্তি তার চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী।

আইনসঙ্গতভাবে কাশ্মীরের আজাদি সম্ভব নয়, আয়ত্ত করা যাবে না সামরিক সংঘর্ষের মাধ্যমেও। ১৯৯০ সালে পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যেসব বৃহত্তর দেশের তারা অংশ ছিল সেখান থেকে। স্বেচ্ছায় তারা সার্বভৌমশক্তি লাভ করেছে। এগুলি—তৃতীয় বিকল্পের অনুসারী যা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। চতুর্থ বিকল্প অনুযায়ী —ড্রব্বদব্ধ বনপ্পপ্সক্ত যেমন ইন্দোনেশিয়া থেকে আলাদা হয়ে গেছে ইউনাইটেড নেশনস এবং শক্তিশালী পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের তদারকি-তত্ত্বাবধানে। কিন্তু এসব কোনও বিকল্পই কাশ্মীরের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। এটাও অসম্ভব যে ভারত এই অংশটি স্বেচ্ছায় অথবা ইউনাইটেড নেশনস অথবা ইউনাইটেড স্টেট্স অফ্ আমেরিকার চাপে ছেড়ে দেবে।

কাশ্মীরী জনগণের একাংশ কট্টর বিচ্ছিন্নতাবাদী যারা ভারতের বিরুদ্ধে। কিন্তু হিন্দু প্রধান জম্মু মনেপ্রাণে ভারতীয়, বরং তারা বলেন, কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে তাদের অনেক দুর্ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে, মাশুল দিতে হচ্ছে। তাই কিছু পাশ্চাত্য সাংবাদিকের উচ্চকণ্ঠ সত্ত্বেও আইনসঙ্গত ভাবে, সামরিক শক্তির জোরে বা কূটনীতিক কৌশলে—ডিপ্লোম্যাটিক্যালি —কাশ্মীর কখনই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে না।

জননীর দ্বারে আজি ওই ...

শোভাবাজার রাজবাড়ি

অর্ণব নাগ

আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি। ঘনঘোর অন্ধকারে নিস্তব্ধ প্রকৃতি। বোধ হয় ঝড় উঠবে। গঙ্গার ঢেউগুলোর অসহ্য তোলপাড়, ওই দূরে জাহাজ দেখা যায়; ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর। নাবিকের নাভিশ্বাস উঠে গেছে, ঢেউয়ের এই উথাল-পাতালে নোঙর করা দায়। এর পূর্বতীরের ভূ-খণ্ডে একটা হাহাকার বুদবুদের মতো উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওইরকম জাহাজে করে আসা এক ব্যক্তি জোব চার্নক এই ভূখণ্ডের নাম রেখেছেন ক্যালকাটা। সেই থেকেই এখানে ফিরিঙ্গি যাতায়াত। এরপর ছ'দশক অতিক্রান্ত। বণিকের মানদণ্ডের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, তা এখন রাজদণ্ডের কায়ায় পরিণত। এখানেই রয়েছেন অসহায়া রামচরণ জায়া। একা ফিরিঙ্গি-তে রক্ষে নেই, মোল্লা দোসর। মেঘের তর্জন-গর্জন আর থামছেই না। জন গোল্ডসবার্গের তত্ত্বাবধায়ক কেল্লা ফোর্ট উইলিয়ামের অন্ধকূপ হত্যার কারণে এমনিতেই বদনাম। রে রে করে তেড়ে আসছে বঙ্গদেশের শেষ স্বাধীন নবাব। দখল করছে সেই কেল্লা। নাম তাঁর সিরাজদৌল্লা। বিভীষিকাময় গহন আঁধারে ডুবে যাচ্ছে ক্যালকাটা। নিকষ কালো অন্ধকারেই তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হলো আলিনগর। এদিকে রাজদণ্ড পাওয়ার লোভে ফিরিঙ্গিরা উন্মত্ত। গঙ্গার পূর্বতীরেই অষ্টভুজাকৃতি ৫ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে তুলবেই তারা রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামে নামাঙ্কিত কেল্লা। তাই ওখান থেকে চলেই যেতে হবে রামচরণের বিধবা পত্নীকে।

ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে। মোল্লা ও ফিরিঙ্গি দু'য়ের নিম্নচাপে ঝড়ের সেই রূপ বিভীষিকাময়। অবশ্য রামচরণপুত্র নবকৃষ্ণ বেশ বড়সড় গাছেই নৌকোটা বেঁধেছেন। যাতে ছোট-খাটো ঝড়-ঝাপটায় সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকা যায়। 'বৃক্ষ'টি ফিরিঙ্গিদের, নাম ওয়ারেন হেস্টিংস। ফিরিঙ্গিটার ফারসি শেখার বেজায় শখ, ভরসা সেই নবকৃষ্ণ। গোঁড়া বৈষ্ণবের বংশ। নবকৃষ্ণ জননীর হিঁদুয়ানীর প্রাবল্যে ম্লেচ্ছদের নো-এন্ট্রি। ঘরে ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গি, বাইরে ম্লেচ্ছ মোল্লা। দু'বেলা শুদ্ধ হতে গঙ্গাজল-ই ভরসা। ফিরিঙ্গিদের ভাব-ভঙ্গী ভারি অদ্ভুত লাগে তাঁর। প্রথম দর্শনে তারা প্রণাম করে না মোটেই, খালি হাত বাড়িয়ে ঝাঁকুনি দেয় (হ্যান্ডশেক)। সাধের গঙ্গাপার ত্যাগ করতে হবে তাঁকে। কিন্তু মা গঙ্গা তাঁর আকুল পারাবার বিস্তৃত করে বয়ে চলেছেন; নবকৃষ্ণ জননীর আর্তস্বর তিনি শুনবেন না তাই কখনও হতে পারে!

দুর্যোগ কিছুটা শান্ত। তবে বঙ্গাকাশে রাতের অমানিশা এখনও কাটেনি। পুত্র নবকৃষ্ণের গুণে গঙ্গাপারেই উঠে এসেছেন তাঁর জননী। এই গঙ্গাপারের নাম শোভাবাজার। নেটিভদের বাস। ফিরিঙ্গি বণিক আর রাজার প্রভেদ ঘুচে গেছে। কারণ ফিরিঙ্গিরাই এখন রাজা আর তাদের দেওয়া রাজা উপাধি নিয়ে বৈষ্ণব নবকৃষ্ণ স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁদের কুলদেবতা রাধাগোবিন্দ জিউ-কে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ইতিহাস কিছুটা ধন্দে। কারণ খৃস্টান ক্লাইভ মাথা নত করল তারই দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণের সূচনা করা দুর্গাপুজোর কাছে।

ইতিহাসের কালস্রোতের তুফান উঠেছে গঙ্গাপারে। ইতিহাস স্রোতের প্রতিকূলে বারবার ফিরে আসতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। তবু মরিয়া চেষ্টা করছে। এই স্রোতের নাম রেঁনেসা। কালখণ্ড—১৮৩৬ থেকে ১৮৮৬। উৎপত্তিস্থল—কামারপুকুর। ঠাকুর আসছেন। মাতৃপ্রেমে আত্মহারা তিনি আসছেন জগতকে শিক্ষা দিতে। তিনি আসছেন গঙ্গাপারের দক্ষিণেশ্বরে, নেটিভ ক্যালকাটার ঝামাপুকুরে। থরথর করে কাঁপছে মেদিনী। এবার কিছু একটা হবেই; পরিবর্তন। ঠাকুর যাচ্ছেন স্টার থিয়েটারে। ওখানে লোক-শিক্ষে হয়। ভবিষ্যতে সেই শিক্ষে দেবে উত্তর কলকাতার গৌরমোহন মুখার্জী লেনের দত্তবাড়ির ছেলে। নবকৃষ্ণের নাতি রাধাকান্তের কল্যাণে শোভাবাজারের দেববাড়ি তখন ধনে-মানে অগ্রগণ্য কলিকাতায়। ঠাকুর বলেছেন—টাকা মাটি, মাটি টাকা। অর্থের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু শান্তি কই? সেই দেববাড়ির যতীনের অসহ্য লাগে, পাগলের মতো খুঁজে বেড়ায় একটুকরো শান্তি। তিনি রামকৃষ্ণদেব, জগতকে অফুরন্ত প্রেম দিতে পারেন, আর শান্তি দিতে পারবেন না? সেই শান্তিটুকুর সান্ত্বনার সন্ধানে যতীন্দ্রনারায়ণ দেবের মাঝেমধ্যেই দিন, এমনকী রাতও কাটে দক্ষিণেশ্বরে। যতীন নরেনেরই সমবয়সী। অল্প বয়স, টগবগ করে ফুটছে রক্ত। নরেনের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসাটা বরাবর-ই একটু বেশি। এতেই যতীনের রাগ।

এই সেই পুণ্য-প্রাঙ্গণ। যেখানে 'বাঙালী ইংলিশম্যান'দের ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার শিক্ষে দিয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। এখানেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন শোভাবাজার রাজবাড়ির কুলদেবতা রাধাগোবিন্দ জিউ। যাঁকে দেখতেই রাজবাড়িতে পদার্পণ

স্টার থিয়েটারের মধ্যে সকলের সামনে একবার যেই না তিনি 'নরেন খা' বলে ফেলেছেন, অমনি চটে গেল সে। বলে ফেলল—'নরেন খা, নরেন খা করছেন। আমরা শালারা ভেসে এসেছি!' ঠাকুর ভালমতো চেনেন যতীনকে। বন্ধু নরেন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা না থাকলে এমন কথা সকলের সামনে শোভাবাজার রাজবাড়ির ছেলে অন্তত বলবে না। তিনি রাগত যতীনের থুতনিটা তুলে ধরলেন; বললেন—ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাস, গিয়ে খাস। ভক্ত আর ভগবানের প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভালবাসার অনবদ্য পরাকাষ্ঠা। যে ভক্তি আর ভালবাসাই যতীন-কে পরবর্তীকালে ক্যামেরায় তোলা ঠাকুরের সাতটি ফটোর মধ্যে একটি সংগ্রহ করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

যতীন খুঁজছে শান্তি, আর ঠাকুর খুঁজছেন মা-কে। দু'জনে দু'জনের প্রতি আন্তরিক হয়ে পড়েছেন। যতীন শান্তি খুঁজতে গেল দক্ষিণেশ্বরে, আর ঠাকুর মা-কে খুঁজতে এলেন যতীনের বাড়িতে। যে বাড়িতে রয়েছেন রাজা নবকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা রাধাগোবিন্দ জিউ। বাঙালী 'ইংলিশম্যান'দের ভিড়ে-ঠাসা পূজা প্রাঙ্গণ। এই ইংলিশম্যানগুলো না ঘরকা, না ঘাটকা। প্রণাম করার এক বিচিত্র আদব-কায়দার উদ্ভাবক এরা। ফিরিঙ্গিদের মতো হাতে ঝাঁকুনিও দেয় না, হিঁদুর মতো গড়ও করে না; খালি হাতজোড় করেই প্রণাম সারে এরা। কিন্তু ঠাকুর ব্যাকুল, মা-কে তাঁর চাই-ই। শুধু ভবতারিণীই তো নয়, মা বহুরূপে রয়েছেন সম্মুখে। মা-কে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতজোড়ে নমস্কার করা চলে! মন্দির প্রাঙ্গণে সেদিন অভূতপূর্ব দৃশ্য। ঠাকুরের কোমল শরীর 'ইংলিশম্যান'দের যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন করতে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলেন শোভাবাজার দেব-বাড়ির মন্দির প্রাঙ্গণে। সেই অসাধারণ বর্ণনা-র জন্য স্বামী সুমেধানন্দের শরণ নিতেই হচ্ছে—

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিধন্য দেবাঙ্গন তীর্থগণ্য
মানুষে নামিল ভগবান
লোকশিক্ষা দান তরে কত ক্লেশ সহ্য করে
গণিল না মান-অপমান

পরম্পরা

বিষ্ণু শক্তি পূজা যেথা নবরূপে এল সেথা
ইতিকথা প্রতি ইঁটে গাঁথা
যুগরথ চক্রচলে কম্বুকণ্ঠে বার্তা বলে
ধূলি নিয়ে ধন্য হয় মাথা

ইতিহাস ফিরে ফিরে আসছে মোহিনী মায়ায়। ঢেউয়ের প্রাবল্য তাকে আটকাতে পারছে না। ফিরিঙ্গি শিক্ষার যে দৈন্যদশা সেদিন লক্ষ্য করেছিলেন নবকৃষ্ণ জননী; আজ তাঁরই বংশধর যতীনের আহ্বানে ঠাকুর লোকশিক্ষে দিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ দেবের প্রাঙ্গণে। ঠাকুরের পদচিহ্নে তৃপ্ত হলো রাজবাড়ির মানুষ। গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে এবাড়িতে আসবেন শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তৎকালীন বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ। ইতিহাসের চাকা ঘোরে, তার প্রমাণ ১৮৮৪ সালের ২৫ মে সেই ফোর্ট উইলিয়ামের সামনেই বৃটিশ সেনাধ্যক্ষের হুকুম এড়িয়ে 'জয়গুরু' বলে শিখ সৈন্যদের ভূমিষ্ঠ হয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর-কে প্রণাম। ঠাকুর জগতকে বহু কিছু শিখিয়েছেন; শিখিয়েছেন সাষ্টাঙ্গে মা-কে প্রণাম করতে। এই শিক্ষার স্কুলের নাম শোভাবাজার রাজবাড়ি।

যতীন্দ্র নারায়ণ দেব— এঁর আহ্বানেই ঠাকুরের রাজবাড়িতে আসা

পুনশ্চ ঃ দুর্যোগ থেমে গেছে। রাত্তির প্রভাতপায়। বিবেক-তেজে সূর্য মধ্যাহ্ন গগনে পৌঁছবে ১৮৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, এবাড়িতেই।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রীম।
২। চরণ চিহ্ন ধরে, নির্মল কুমার রায়।
৩। প্রতীপ দেব, শোভাবাজার রাজবাড়ির বংশধর।

(ছবিগুলি তুলেছেন শিবু ঘোষ)

অনিরুদ্ধ ভট্ট

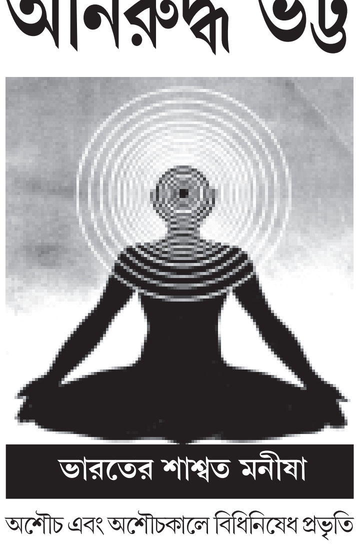

ভারতের শাশ্বত মনীষা

চিরন্তন চক্রবর্তী ॥ অনিরুদ্ধ ভট্ট ছিলেন খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর নিবন্ধকার এবং তৎকালীন বঙ্গাধিপতি বল্লাল সেনের ধর্মাধ্যক্ষ। তিনি বল্লাল সেনের শিক্ষাগুরুও ছিলেন। এজন্য বল্লাল সেন তাঁর দানসাগর গ্রন্থের প্রারম্ভে গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট সম্বন্ধে বলেছেন—বৃহস্পতি যেমন নাকি ইন্দ্রের গুরু ছিলেন, সেরকম অনিরুদ্ধ ছিলেন নরপতি বল্লাল সেনের গুরু। অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁর গ্রন্থ শেষে নিজেকে মহামহোপাধ্যায় ও ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাধিকরণিক বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন চম্পহট্টীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তিনি বেদ ও স্মৃতি বিষয়ে আদিপুরুষ রূপে বারেন্দ্রভূমিতে পূজ্য ছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'হারলতা' ও 'পিতৃদয়িতা'-দুইখানি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন সামবেদীয়, এজন্য তাঁর পিতৃদয়িতা গ্রন্থে সামবেদীয় আচারাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর হারলতা গ্রন্থ অশৌচ বিষয়ক, এতে জন্ম ও মৃত্যুর জন্য অশৌচ এবং অশৌচকালে বিধিনিষেধ প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, তিনি সমাজ রক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই গ্রন্থরচনায় প্রয়াসী হন। এজন্য প্রচলিত রীতিনীতির প্রতিই বেশি নজর দিয়েছেন। সমাজ সংস্কারের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বল্লাল সেন সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। গুরু অনিরুদ্ধের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় জ্ঞান অনুসারে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য দানসাগর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উল্লেখ্য, অনিরুদ্ধ ভট্ট রচিত পিতৃদয়িতা গ্রন্থে নির্দেশিত আচারাদির মধ্যে শ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান এখন আরও বিস্তৃতভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। হারলতা গ্রন্থের অভিমত স্থানে স্থানে রঘুনন্দন কর্তৃক খণ্ডিত হলেও শুদ্ধিতত্ত্বে একে স্থানবিশেষ প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন রঘুনন্দন। বাংলাদেশে ভবদেব ভট্টের নির্দেশ অনুসারে দশকর্ম বিষয়ক কর্ম অনুষ্ঠিত হলেও শ্রাদ্ধ পদ্ধতি বিষয়ে ভবদেবের কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ না থাকায় অনিরুদ্ধ ভট্টের নির্দেশ এখন পালিত হয়।

অঙ্গনা

গোপালের মা

কুন্তলা দত্ত।। দুইজন বিধবা ব্রাহ্মণী (সম্ভবতঃ ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে) পায়ে হেঁটে পটলডাঙার গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের কামারহাটিস্থ ঠাকুরবাড়ি থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করতে আসেন। একজন গোবিন্দ দত্তের বিধবা পত্নী আর অঘোরকামিনী নাম্নী একজন 'কড়ে রাঁড়ি' অর্থাৎ অতি অল্পবয়সের বিধবা—যিনি গোবিন্দবাবুদের পুরোহিতের ভগিনী। ইনি গোবিন্দবাবুর ঠাকুরবাড়ীর মেয়েমহলের একখানা ঘরে থেকে দেবসেবা ও জপতপে কাল কাটাতেন। সংসার বলতে তাঁর কিছুই নেই। অলঙ্কার ইত্যাদি স্ত্রীধন বিক্রির পাঁচসাত শত টাকা কোম্পানীর কাগজ ক'রে গোবিন্দবাবুর স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত ছিল। ওই টাকার সুদে তাঁর মোটামুটি চলে যেত। গোবিন্দপত্নীর সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি সব সময়ে অঘোরকামিনী তথা তাঁর পিতৃকুলের সহায়তা করতেন। গোবিন্দ-পত্নীও ভক্তিমতী ছিলেন। মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ কার্তিক মাসে নিয়ম-সেবার সময় ঠাকুরবাড়িতে এসে থাকতেন ও ঠাকুরসেবার তত্ত্বাবধান করতেন। পরমহংসদেবের নাম ও খ্যাতির কথা তাঁরা শুনেছিলেন। তাই সাধুদর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এদের দু'জনকে সমাদরে গ্রহণ করেন। ভক্তি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দেন এবং তাঁর সুললিত কণ্ঠের গানে দু'জনকে সমাদরে গ্রহণ করেন। বিদায়কালে আবার আসবার কথা বলেন। দু'জনের ভক্তির প্রশংসা করেন। দুই রমণীরও ঠাকুর সম্বন্ধে ভাল ধারণাই হয়েছিল। গোবিন্দপত্নীর সংসার, কন্যা জামাতা ছিল—ইচ্ছে করলেই যাওয়া সম্ভব ছিল না। অঘোরকামিনীর ঝাড়া হাত-পা, তিনি দিনকতক পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখেই ব'লে উঠলেন—"এসেছ? আমার জন্য কি এনেছ দাও।"

অঘোরকামিনী তো ভেবে আকুল। কত লোক এঁকে কত ভাল ভাল জিনিস খাওয়াচ্ছে—আর তিনি এনেছেন অতি সাধারণ দু'টি সন্দেশ। কি ক'রে তা বের করেন? তাও কি ছাই আসবামাত্র খেতে চাওয়া! সঙ্কোচের সঙ্গে তিনি ওই সন্দেশ বের ক'রে দিলেন। ঠাকুর মহানন্দে খেতে খেতে বললেন—"তুমি পয়সা খরচ ক'রে সন্দেশ আন কেন? নারকেল নাড়ু ক'রে রাখবে—তাই দু'টি নিয়ে আসবে। অথবা তুমি যা রান্না কর—শাকচচ্চড়ি, বড়ি দিয়ে ঝোল—এসব নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।"

দিনকতক পরে অঘোরকামিনী আবার শাকচচ্চড়ি হাতে নিয়ে হেঁটে এসে উপস্থিত। সেই রান্না খেয়ে ঠাকুর মহা খুশী হয়ে বলতে লাগলেন,—"আহা কি রান্না! যেন সুধা, সুধা।" আনন্দে অঘোরকামিনীর চোখে জল এল। ভাবলেন,—"আমি গরীব কাঙাল, তাই দয়াল ঠাকুর এই সামান্য জিনিসের অত বড়াই করছেন।"

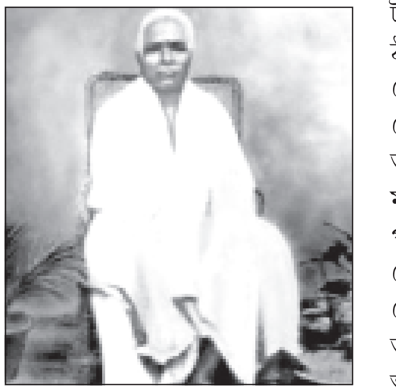

এইভাবে ঠাকুর প্রায়ই এটা-ওটার ফরমাস করেন আর 'কামারহাটির বাম্‌নী' (ঠাকুর তাঁকে এই নামেই উল্লেখ করতেন) রেঁধে আনেন। এক এক সময় ব্রাহ্মণী ভাবেন,—"গোপাল! তোমায় ডেকে শেষে এই হ'ল? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে 'খাই খাই' করে। ধর্মপ্রসঙ্গ দূরে গেল, খালি খাই খাই। ধুত্তোর আর আসব না।" কিন্তু ভাবলে কি হবে? দক্ষিণেশ্বরের ফটক পেরিয়ে রাস্তায় পা দেওয়ামাত্র কে যেন তাঁকে টানতে থাকে, পা আর চলে না। কোনওমতে কামারহাটি পৌঁছান। তিনি তখনও বুঝতে পারেননি যে তাঁর গোপাল নরদেহে তাঁর সামনে উপস্থিত।

এভাবে চার-পাঁচ মাস চলে গেছে। অঘোরকামিনী আসা-যাওয়া করছেন। তাঁর জীবন নিয়ম-শৃঙ্খলায় চলত। রাত দু'টোয় উঠে শৌচাদি সেরে জপে বসতেন। ৮/৯ টায় জপ সাঙ্গ ক'রে স্নান ও ঠাকুরদর্শন, ঠাকুরের সেবার কাজে সহায়তা সেরে ভোগরান্না হয়ে গেলে নিজের রান্নাখাওয়া সেরে একটু বিশ্রামের পর আবার জপে বসা। তারপর সন্ধ্যারতি দেখে আবার জপ। এর মধ্যে রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি কখনো পড়তেন আর মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। তিনি স্পষ্টভাষিণী ছিলেন। অন্যায় দেখলে ব'লে দিতেন। বাজে গল্পগুজব ভালবাসতেন না, কাজেই কেউ তাঁর কাছে আসত না। চিত্তবিক্ষেপের কোনো সুযোগ ছিল না। তিনি গোপালমন্ত্র নিয়েছিলেন। ত্রিশ বৎসর এরূপ নিষ্ঠাভরে কার্যত সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করার পর তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পান।

এ সময় একদিন যথারীতি জপে বসেছেন, রাত তিনটা হবে। হঠাৎ তিনি দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর বাঁদিকে বসে আছেন। ঠিক দক্ষিণেশ্বরে যেমন দেখেছেন জীবন্ত—মুচকি মুচকি হাসছেন। অঘোরকামিনী বলেন,—"আমি তো অবাক হয়ে দেখছি, ভাবছি এ সময়ে ইনি কোথা থেকে এলেন! তারপর সাহসে ভর ক'রে বাঁ হাত দিয়ে গোপালের (রামকৃষ্ণদেবকে তিনি ওই নামে ডাকতেন) হাতখানা ধরেছি, অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল আর তার মধ্য থেকে এতবড় (হাত দিয়ে দেখিয়ে) দশমাসের সত্যিকার গোপাল বেরিয়ে এল। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে,—"মা, ননী দাও"। সে কি চাউনি! আমি তো দেখে শুনে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠলুম। ভাগ্যে বাড়িতে কেউ নেই;নইলে লোক জড়ো হ'ত। কেঁদে বললুম,—"বাবা আমি দুখিনী কাঙালিনী, ননী কোথায় পাব?" গোপাল কি তা শোনে? খালি খেতে চায়। ব্রাহ্মণীর জপ তপ সব মাথায় উঠল। গোপাল মালা কেড়ে নেয়, কোলে চেপে বসে আবদার করে।

ভোর হতেই গোপালকে কাঁধে নিয়ে অঘোরকামিনী চললেন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ভাবস্থ এলোথেলো অবস্থায়। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবস্থ হয়ে তাঁর কোলে বসে পড়লেন। এর আগে ঠাকুরকে কখনও ভাবাবস্থায় কোনও স্ত্রীলোককে স্পর্শ করতে দেখা যায়নি। তবে শোনা যায় যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী যশোদার ভাব হ'লে ঠাকুর কখনও কখনও তাঁর কোলে বসতেন। ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হলেও অঘোরকামিনী কিন্তু ভাবাবেশে নেচে নেচে ছড়া কাটছেন—কখনও বলছেন—"এই যে গোপাল আমার কোল থেকে উঠে তোমার মধ্যে ঢুকে গেল। আয় বাবা গোপাল, আমার কোলে আয়।" ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আনন্দিত হয়ে বললেন,—"দেখ দেখ, ওর মন এখন গোপাললোকে চলে গেছে।"

এককথায় বলা যায় রামলালকে নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর যে লীলা করেছিলেন, মহাভাগ্যবতী অঘোরকামিনী গোপালকে নিয়ে টানা দু'মাস ঐরূপ লীলায় বিভোর। গোপালের জীবন্ত বিগ্রহ কোনো কোনো ভক্তিমতী পেয়েছেন, কিন্তু টানা দু'মাস এই লীলায় মগ্ন থাকার কথা আর শোনা যায়নি।

অঘোরকামিনী এরপর থেকে রামকৃষ্ণসঙেঘ 'গোপালের মা' নামে অভিহিত হলেন। গোপালের উৎপাতে তাঁর আচারনিষ্ঠা সংস্কার কিছু আর রইল না। গোপাল খেতে খেতে মা'র মুখে খাবার গুঁজে দেয়, না খেলে কাঁদে। সুতরাং এসব ছাড়তেই হ'ল। একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পরিবেশন করার সময় কোনওভাবে রামকৃষ্ণদেবের হাতে ভাতের কাঠিটি ছোঁয়া লাগে। গোপালের মা'র আর খাওয়া হ'ল না। হাঁড়িসুদ্ধ ভাত গঙ্গায় ফেলা গেল। কিন্তু গোপালের কৃপায় পরে তাঁর এমন সংস্কারমুক্ত মন হয়েছিল যে, একদিন স্বামীজী প্রসাদী মাংস খাবার পর উঠে হাত ধুতে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন একজনকে জায়গা পরিষ্কার ক'রে বাটিটা উঠিয়ে নিতে বললেন, তখন গোপালের মা সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওইসব হাড়গোড় সহ স্থানটি পরিষ্কার ক'রে উচ্ছিষ্ট বাটিটা নিয়ে যান। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুব আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন,—"দেখ, দেখ, কি উদার হয়ে যাচ্ছে"।

খোসা থাকলে তবে আম পাকে—আম তয়ের হ'তে খোসা দরকার, কিন্তু পেকে গেলে আর খোসার প্রয়োজন নেই। তেমনি সাধনজীবন তৈরি হবার জন্য আচার-নিষ্ঠা দরকার, কিন্তু ওটি আঁকড়ে থাকলে হবে না—খোসা না ছাড়ালে আম খাওয়া যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে ফেরার পর গোপালের মাকে প্রশ্ন করেছিলেন,—"আমার সব সাহেব মেমসাহেব চেলা আছে। তাদের ছুঁলে তোমার জাত যাবে না তো?" গোপালের মা বললেন, "সে কি বাবা! তারা তোমার ছেলেমেয়ে। আমি তাদের নাতি-নাতনী ব'লে কোলে করব।"

সারা বুল, মিস্ ম্যাকলাউড ও নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি সাদরে তাঁদের নিজের বিছানায় বসিয়ে সস্নেহে চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন করেন। তাঁদের অনুরোধে গোপালের সঙ্গে তাঁর লীলাকাহিনী সাশ্রু নয়নে বর্ণনা করেন। ঘরে যে মুড়ি ছিল নিঃসঙ্কোচে তাঁদের খেতে দেন। সারা ভক্তিভরে ওই মুড়ি আমেরিকায় নিয়ে যান। স্বামীজী তাঁদের বলেছিলেন,—"তোমরা দেখে এলে তপোনিষ্ঠ ঈশ্বরগতপ্রাণা ভারতনারী, যার দৃষ্টান্ত এখন বিলীয়মান।"

গোপালের মা শাস্ত্রালোচনা বা সৎসঙ্গ পাননি। শ্রীশ্রীমা বলতেন—"জপাৎ সিদ্ধি"। পরম নিষ্ঠাভরে কেবল জপ এবং বিষয়চিন্তা সম্পূর্ণ বর্জন—এই ছিল তাঁর সাধনা। রামকৃষ্ণদেবের দর্শন পাবার মাস চারেক পরেই তিনি রামকৃষ্ণদেবই যে তাঁর গোপাল এটা উপলব্ধি ক'রে দু'মাস জীবন্ত গোপালের সঙ্গ অহরহ পেয়ে অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হন। মাস দুই পরে আর অহরহ সেই লীলাদর্শন হ'ত না। তখন কাতরভাবে রামকৃষ্ণদেবকে জানালে রামকৃষ্ণদেব বলেন,—"কলিতে ওরূপ অহরহ দর্শন হ'লে শরীর থাকে না।" মধ্যে মধ্যে অবশ্য গোপাল তাঁকে দর্শন দিতেন। মাড়োয়ারী ভক্তরা প্রায়ই তালমিছরি, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য ঠাকুরের জন্য নিয়ে আসতেন। ঠাকুর সেগুলি খেতেন না, কারণ ওইসব জিনিস সকাম প্রার্থনাসহ দেওয়া হ'ত। ওইগুলি খেলে ভক্তির হানি হয়। ভক্তদের মধ্যেও একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া কাউকে দিতেন না। স্বামীজীর কথায় বলতেন,—"ওর মধ্যে জ্ঞানাগ্নি জ্বলছে, কলাগাছ পড়লে ভস্ম হয়ে যায়। ওর কোনো ক্ষতি হবে না।"

কিন্তু গোপালের মাকে তিনি ওইসব

(এরপর ১৩ পাতায়)

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।। ১৩

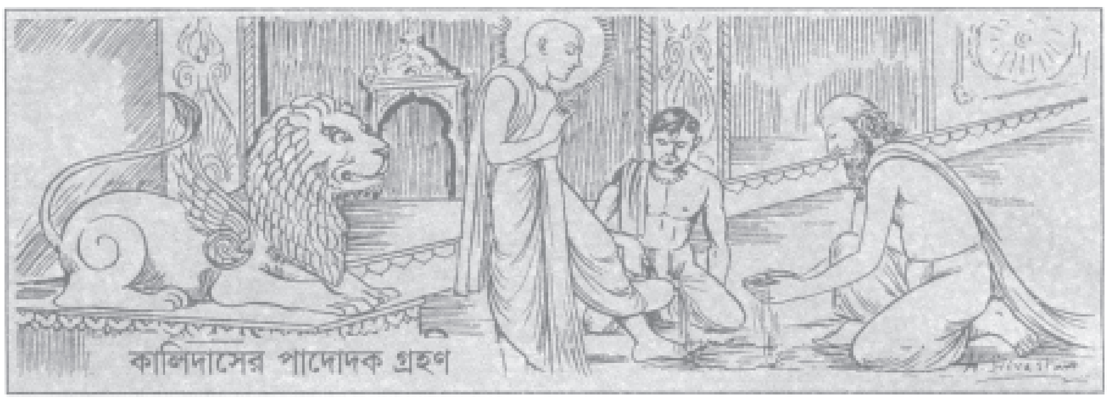

শ্রীশ্রীজগন্নাথের দর্শন করতে যাবার সময় মহাপ্রভু একটা ডোবায় পা ধুয়ে যেতেন। ভক্ত(কালিদাস সেই চরণ ধোয়া জল মাথায় স্পর্শ করেছিলেন।

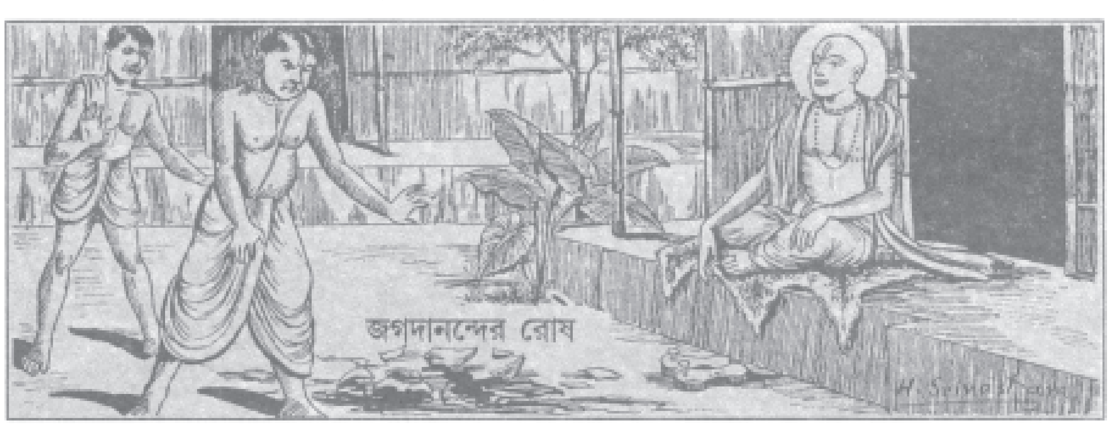

ভক্ত জগদানন্দর সুগন্ধি তেল মহাপ্রভু মাখতে অস্বীকার করলে তিনি অভিমানে তেলের হাঁড়িটি ভেঙে ফেলেন। পরে মহাপ্রভু জগদানন্দকে আদর করে ভোলান।

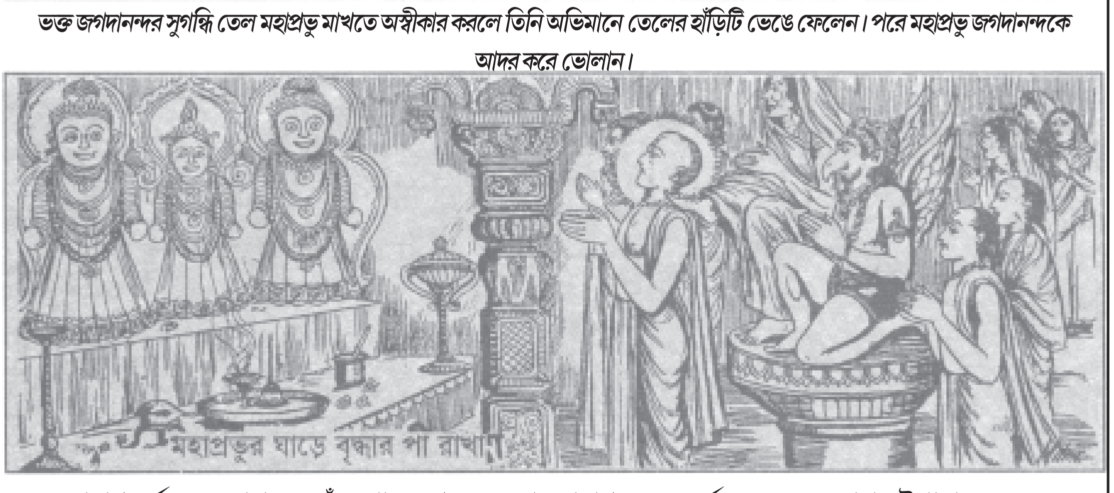
মহাপ্রভুর ঘাড়ে বৃদ্ধার পা রাখা

জগন্নাথ দর্শনরত মহাপ্রভুর কাঁধে পা রেখে এক বৃদ্ধা জগন্নাথদেবকে দর্শন করছেন। মহাপ্রভু ইশারায় ভক্তদের বৃদ্ধাকে কিছু বলতে নিষেধ করলেন।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)

সমাবেশ সমাচার

রবি ঠাকুরের জন্ম-সার্ধশতবর্ষে কবিপ্রণাম

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে
বিদ্যাভারতী মালদহ শাখার পরিচালনায়

মালদায় আয়োজিত রবীন্দ্র-সন্ধ্যা

গত ১৫ মে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষ জন্ম উৎসবকে স্মরণ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা শাখার সম্পর্ক বিভাগ এবং বিদ্যাভারতী মালদহ শাখার পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল মালদা টাউন হলে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি, গীতিনাট্য, নাচ এবং দেশাত্মবোধক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। মালদা শহরের অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশু মন্দির, নেতাজী সুভাষ রোডের শিশু মন্দির এবং মাধব নগরের সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। টাউন হলের পাঁচশত আসন ভর্তি হয়েও ভীড় বাইরে চলে এসেছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকার' সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য। সভাপতি হিসেবে ছিলেন বিদ্যাভারতীর উত্তরবঙ্গ শাখার প্রধান তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ডঃ সত্যপদ পাল। ডঃ আঢ্য তাঁর বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দার্শনিক ও উপনিষদকে আশ্রয় করে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও কবিতার অংশ তুলে ধরেন। 'মননে, স্মরণে ও সংগীতে রবীন্দ্র সন্ধ্যা' নামাঙ্কিত সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে তিনটি শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য—ভীমচন্দ্র মাহাতো, ভূপেন বর্মন ও বিকাশ চন্দ্র ঘোষের ভূমিকা উল্লেখ করতে হয়।

সংস্কার ভারতীর কবিপ্রণাম

২৫ বৈশাখ (ইং ৯ মে ২০১০) উপলক্ষে কল্যাণ ভবনে একটি বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ শাখা।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল বাগুইআটী শাখার শিশু শিল্পীদের অভিনীত নাটক 'বিনি পয়সার ভোজ'। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনৃত্যে গুরু প্রণাম অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করেন দক্ষিণ হাওড়া, গোবরডাঙ্গা ও উত্তর কলকাতার সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা।

উল্লেখ্য, সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে আগামী ছয়মাস ব্যাপী শাখা স্তরে কবিপ্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ।

বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ২২ মে হাওড়ার মতিলাল নেহরু স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্ম-জয়ন্তী উদযাপিত হয়। ডাঃ বিশ্বনাথ চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ উমাশঙ্কর গাঙ্গুলি, হাওড়া পৌর-নিগমের অধ্যক্ষা স্বপ্না ভট্টাচার্য, পুর-নিগমের বিরোধী দলনেতা সুনীল আদক, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিবশংকর গুপ্ত, সৌমেন চক্রবর্তী, যতীন সামন্ত প্রমুখ। প্রধান শিক্ষিকা অনিন্দিতা দাসের পরিকল্পনায় শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য, নৃত্যালেখ্য ও সংগীত পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের সম্পাদক নির্মল ঘোষাল।

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৮ ও ৯ মে মাণিকতলাস্থিত কল্যাণ-ভবনে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের বার্ষিক সাধারণ সভা। দুইদিনের এই সভায় বিভিন্ন সময়ে সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রথিতযশা নৃত্যশিল্পী অমলা শংকর, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র দূরদর্শন ও মঞ্চ শিল্পী তপন গাঙ্গুলী, সুরকার ও গায়ক প্রশান্ত ভট্টাচার্য এবং সমাজসেবী ও উদ্যোগপতি অশোক মোদী, বিমল লাঠ এবং স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার।

সাধারণ সভায় সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের ২০১০-২০১১ সালের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এই সভায় কেন্দ্রীয় সহ-সংগঠন মন্ত্রী শ্রী আমীর চাঁদজী পূর্বক্ষেত্রের কার্যকরী সমিতি ঘোষণা করেন। এই সমিতির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন ভিক্টর ব্যানার্জী, এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশ কার্যকরী সমিতির নবমনোনীত সভাপতি হলেন তপন গাঙ্গুলী।

২৩টি শাখা থেকে আগত প্রায় ৭০ জন সদস্যের এই বার্ষিক সভায় দক্ষিণবঙ্গের আসন্ন রজতজয়ন্তী বর্ষের (২০১১-২০১২) প্রাক্কালে শাখা ও সদস্য বৃদ্ধি অভিযান, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, ২০১০ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য শিল্পী সম্মেলনের পরিকল্পনা এবং সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে 'স্বস্তিকা'-র প্রসার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ সত্যনরায়ণ মজুমদার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, আদর্শ রূপায়ণকল্পে কার্যকর্তা সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত পথ নির্দেশ দেন।

সভায় অখিল ভারতীয় সহনাট্য প্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের কার্যকরী উপদেষ্টা পূর্ণচন্দ্র পুইতুন্ডী, উপদেষ্টা মণ্ডলীর অন্যতম কমল ব্যানার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় কার্যকরী সমিতি মনোনয়ন পর্বটি পরিচালনা করেন পূর্বক্ষেত্র সাধারণ সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য। দুই দিনের সামগ্রিক সভার কাজ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। গত ৯ মে বিকেলে সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু কর্তৃক গীত বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়।

সংস্কার ভারতীর পূর্বক্ষেত্র (পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা) কার্যকরী সমিতিতে রয়েছেন— সভাপতি—ভিক্টর ব্যানার্জী, সহ-সভাপতি—তনুশ্রী শঙ্কর, অশোক মোদী, সাধারণ সম্পাদক—সুভাষ ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ—দেবাশীষ লাহিড়ী, সদস্য—বিকাশ ভৌমিক-(উত্তরবঙ্গ), দেবেন্দ্র নারায়ণ সতপতি-(উড়িষ্যা), মুখ্য উপদেষ্টা—কেশব দীক্ষিত, কার্যকরী উপদেষ্টা—পূর্ণচন্দ্র পুইতুন্ডী, উপদেষ্টা মন্ডলী—অমলা শঙ্কর, বীরেশ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, বিমান মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম গাঙ্গুলী, সুদীপ মখোপাধ্যায়, তনুশ্রী শঙ্কর, অলকা কানুনগো, মতিলাল সোনি, বিমল লাট, অশোক মোদী, মধুসূদন চক্রবর্তী, অরুণ চক্রবর্তী, বিকাশ ভট্টাচার্য, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের কার্যকরী সমিতিতে রয়েছেন ঃ সভাপতি—তপন গাঙ্গুলী, সহ-সভাপতি—সুকুমার সেন, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, আশীষ কর্মকার, সোমেশ্বর বড়াল, সাধারণ সম্পাদিকা— নীলাঞ্জনা রায়, সংগঠন সম্পাদক— ভরত কুন্ডু, সম্পাদক মন্ডলী— নিখিল সমাদ্দার, আশীষ গুপ্ত, ডঃ বাসুদেব সাহা, তিলক সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ— শ্যামল ভট্টাচার্য, কার্য্যালয় সম্পাদক—শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়, সদস্য— প্রদ্যুৎ মুকুটমণি, শ্রীমতি মঞ্জুলী ভট্টাচার্য।

অমলাশঙ্কর

ভিক্টর ব্যানার্জী

গোপালের মা

(১২ পাতার পর)

খাদ্যদ্রব্য খাওয়াতেন। বলতেন,—"হরিময় এই শরীরে হরি ছাড়া কিছু নেই।" গোপালের মাকে তিনি কত উচ্চে স্থান দিতেন এ থেকে বোঝা যায়।

মাহেশের রথ দেখতে গিয়ে গোপালের মা সমবেত জনতার প্রত্যেকের মধ্যে তাঁর গোপালের দর্শন পেয়েছিলেন। নিজেই বলছেন,—"তখন আমি আর আমাতে ছিলুম না। নেচে হেসে কুরুক্ষেত্তর করেছিলুম।" তাঁর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনবার বলেছিলেন,— "তোমার সব হয়েছে।"

আমরা জপ করি বটে, কিন্তু জপের মাহাত্ম্যে ঠিক বিশ্বাস আসে না। সরল মনে সদাচারী হয়ে নিষ্ঠাভরে জপের দ্বারা গোপালের মা ঠাকুরের কৃপা আকর্ষণ ক'রে রামকৃষ্ণসঙ্ঘে বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তিনি শেষ জীবনে নিজেকে সন্ন্যাসিনী বিবেচনা ক'রে গেরুয়া পরতেন।

ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল
মালদা জেলা শাখা

উত্তরবঙ্গে শিক্ষণ মণ্ডলের শিক্ষক সম্মেলন

গত ১৬ মে এই প্রথম ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল উত্তরবঙ্গের শিক্ষক সম্মেলন হয়ে গেল মালদা শহরের ললিতমোহন শ্যাম মোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে। ৮৫ জন শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীদের উপস্থিতিতে দিনভর শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক বিনয়ক কানেটকর, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিভাস দাস পুরকায়স্থ, ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অহিভূষণ দাস, ডঃ তুষার কান্তি ঘোষ, সত্যনারায়ণ মজুমদার ও স্বস্তিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য।

প্রকাশ্য অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ঃ—

১। সংস্কৃত ভাষাকে আব্যশিক। ২। আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে ভারতীয় সংস্কৃতির আধারে চালু। ৩। শরীর শিক্ষাকে সিলেবাসে আব্যশিক। ৪। দেশে একই পাঠ্যসূচী চালু। ৫। ভারতীয় মহাপুরুষদের বেশী করে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা।

সম্মেলনে বিজয় আঢ্য সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসারে সংস্কৃত ভারতীর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। সমাপ্তি ভাষণ দেন সত্যনারায়ণ মজুমদার।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

সমাজ সেবা ভারতীর পরিচালনায় গত ৬ এপ্রিল, বাঁকুড়া পাঞ্চ জন্যভবনে একটি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিবিরে ডাঃ বি. সি. সাহা, ইঞ্জেকশন পদ্ধতিতে মোট ৪০ জন রুগীর চিকিৎসা করেন। বাঁকুড়া বিভাগ প্রচারক প্রভাত মণ্ডল উপস্থিত থেকে শিবির পরিচালনায় পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

শোক সংবাদ

বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিশু চিকিৎসক ডাঃ অবনীকান্ত চক্রবর্তী গত ১৭ মে সকালে বরাহনগর রিপন নার্সিংহোমে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি স্ত্রী সহ তিন কন্যাকে রেখে গেলেন। প্রসঙ্গত, গত বছর হরিপুর সরস্বতী শিশু মন্দির তৈরির জন্য তিনি এক বিঘা জমি দান করেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর মহকুমা প্রচারক আশিস সিংহের পিতৃদেব রামচন্দ্র সিংহের জীবনাবসান হয় গত ২৩ মে। বাঁকুড়ার ভৈরবপুর নিবাসী রামচন্দ্রবাবুর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। স্ত্রী সহ তিনপুত্র, দুই কন্যা, দুই পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেলেন তিনি।

* * *

গত ২৩ মে আর এস এসের ঈশ্বরপুর (ইসলামপুর) মহকুমার প্রাক্তন প্রচারক জয়ন্ত মণ্ডলের মাতা ছবি মণ্ডল ৬৫ বৎসর বয়সে বাঁকুড়া জেলার মোলবনার নিজ বাস ভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর তিন পুত্র বর্তমান।

* * *

আর এস এসের কলকাতা মহানগর সম্ভাগের উত্তর-পূর্ব ভাগের স্বয়ংসেবক বিপ্লব চক্রবর্তী ও বিকাশ চক্রবর্তীর পিতা বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৬০ বছর বয়সে পরলোকগত হয়েছেন।

* * *

সঙ্ঘের উত্তর-পূর্ব কলকাতা ভাগের স্বয়ংসেবক অভিজিৎ দাসের পিতা অনিল দাস ৮০ বছর বয়সে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন।

মঙ্গলনিধি

সঙ্ঘের বনগাঁ নগর কার্যবাহ কল্যাণ কুমার দাসের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে গত ২৩ মার্চ প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে সমাজ সেবার কাজের জন্য ২০০১ টাকা মঙ্গলনিধি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গ সমাজ-সেবা ভারতীয় সম্পাদিকা শাশ্বতী নাথ উপস্থিত ছিলেন।

খেলার জগৎ

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কতটা টানবেন পর্তুগালকে?

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। ২০০৪-এ ইউরো কাপে পর্তুগালের অবিস্মরণীয় ফুটবলের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি পাঠককূল। তরুণ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর যাদুশৈলীর ওপর ভর করে পর্তুগাল সেবার ইউরোর ফাইনালে পৌঁছে যায়। ফাইনালে অবশ্য পর্তুগালকে থাকতে হয় গ্রীসের বলদৃপ্ত ফুটবলের সামনে। কিন্তু গ্রীস চাম্পিয়ন হলেও দুনিয়া জোড়া দর্শকের চোখ-মন আবিষ্ট করে দেয় পর্তুগালের ছন্দবদ্ধ ও সুষমায় ভরা ফুটবল লাবণ্য। রোনাল্ডোর সঙ্গে দারুণভাবে সঙ্গত করেছিল লুনো গোমেজ, লানি, ডেকোরা। মনে পড়িয়ে দিয়েছিল ষাটের দশকের সেই ত্রিমূর্তির কথা। ইউসেবিও, কলুনা, টোরেসের ত্রিফলা আক্রমণ যে কী বস্তু তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল বড় শক্তির দলগুলি।

ইউসেবিওর যোগ্য উত্তরসূরী রোনাল্ডো। দু'পায়ে রয়েছে তিন রকমের ডজ ও ড্রিবলিং। দুরন্ত গতি, উইংকে কাজে লাগিয়ে ফালা ফালা করে দেন বিপক্ষ ডিফেন্সকে, ইনসাইড কাট করে 'ডাউন দ্য মিডল' ২০-২৫ গজের স্প্রিন্ট টেনে চোখ ধাঁধিয়ে দেন দেশের দোলায়, পায়ের কাজে গোলমুখ খুলে। এককথায় অলরাউন্ড ইউটিলিটি ফুটবলার। ২০০৮ মরসুমে ইউরোপিয় ক্লাব ফুটবলে ম্যাঞ্চে স্টার ইউনাইটেডের হয়ে তার খেলা যে উচ্চতায় উঠেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে কেবল জর্জ বেস্টের।

রোজোমিয়ান জর্জ বেস্ট ম্যানইউকে প্রায় অন্যগ্রহের টিম বানিয়ে ছেড়েছিল ষাটের দশকে। দুনিয়ার সব ক্লাবকে নতজানু করে দিয়েছিল ম্যানইউ ওই বেস্টের দাপটে। স্পেনের জগৎবিখ্যাত রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ম্যানইউয়ের টক্কর ছিল সে সময় বিশ্ব ফুটবলে সবচেয়ে আলোচনার বিষয়। ম্যাটবুসাবির মতো কোচ, বেস্ট, চার্লটনের মতো 'গ্রেট' ফুটবলার ম্যানইউকে' অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে নিয়ে গেছিল বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত। সেই ঘরানা, সেই কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনেন স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের কোচিংয়ে রোনাল্ডো, তেভেজ, রুনি, নিস্তেলরুইরা ২০০৭-২০০৮ মরসুমে। ইউরোপ সেরা হবার পর বিশ্বক্লাব কাপেও অপ্রতিরোধ্য ছিল ম্যানইউ।

ওই সময় রোনাল্ডোকে নিয়ে মাতামাতির জেরে অনেকটাই নিষ্প্রভ ছিলেন মেসি, কাকার মতো সুপার জিনিয়াসরা। যদিও মেসির নেতৃত্বে ২০০৮-এ অলিম্পিক সোনা জেতে আর্জেন্টিনা। কাকাও গোটা মরসুমে ধারাবাহিক ভাল খেলেছেন ক্লাব ও দেশের হয়ে। কিন্তু রোনাল্ডোর গ্ল্যামার ও ক্রীড়ায়ত ঔজ্জ্বল্যে ঢাকা পড়ে যান দুজনেই। ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হন সে বছর রোনাল্ডো এবং ম্যানইউয়ের হয়ে এক মরসুমে জর্জ বেস্টের করা ৩৮ গোলের রেকর্ড ভেঙে হয়ে ওঠেন নতুন মহাকাব্যের নায়ক। সে বছর ইউরোপীয়ান কাপেও চমৎকার খেলেছিলেন রোনাল্ডো, যদিও তার দল ২০০৪-এর কীর্তি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। আর ওই ইউরো কাপেই তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে উঠে আসে চ্যাম্পিয়ন স্পেনের অসাধারণ স্ট্রাইকার টেরেস।

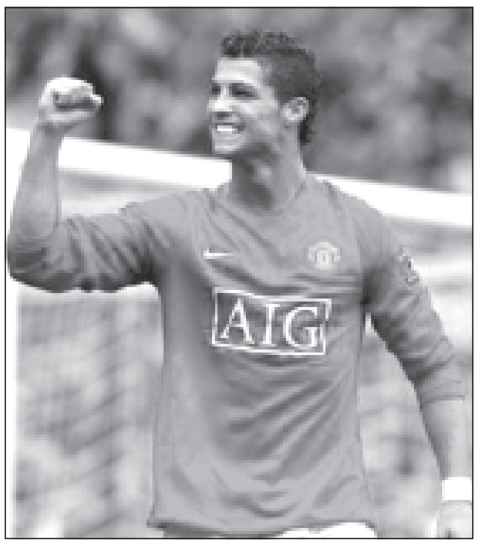

এই মুহূর্তে বিশ্ব ফুটবলে রোনাল্ডোর সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় মেসি, কাকা, টোরেস, রুনির নাম। এরাই বর্তমান বিশ্বে সেরা পাঁচ ফরোয়ার্ড। তবে বাকি চারজন এমন এক হেভিওয়েট দলে খেলেন যার ফলে তারা অনেক রিল্যাক্স করে খেলতে পারেন। অন্যদিকে পর্তুগাল অনেকাংশে রোনাল্ডোর মুখাপেক্ষী। আসন্ন বিশ্বকাপে পর্তুগালের হয়ে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে রোনাল্ডোকে। ২০০৪-এর পর্তুগাল আর নেই। বেশ কয়েকজন বড়মানের ফুটবলার অবসর নিয়েছেন। নানি ও ডেকো ছাড়া বিশ্বফুটবলে পরিচিত মুখ খুব একটা নেই।

তাই রোনাল্ডোকে মাঠ ও মাঠের বাইরে অনেক বেশি দায়িত্ব সচেতন হয়ে সব অর্থেই নিজেকে ছাপিয়ে যেতে হবে। পর্তুগালের নান্দনিক ফুটবলে মুগ্ধ বিশ্ববাসী। তবে তাদের ট্রাক রেকর্ড তত ভাল নয় অন্তত বিশ্বকাপের রেকর্ড তাই বলে। ইউসেবিওর আমলে সেই ১৯৬৫-তে সেমিফাইনালে উঠেছিল। এবার যদি রোনাল্ডোরা সেই কৃতিত্ব ছুঁতে পারেন তবে দেশবাসী তাকে ইউসেবিওর মতোই হৃদয়ের 'হল অব ফেমে' স্থান দেবেন। যদিও ফিফার 'হল অব ফেমে' যে কোনও মুহূর্তে ঢুকে যাবেন রোনাল্ডো তার এযাবৎ কীর্তি গৌরবে। রোনাল্ডো নিজেও বোঝেন এই সত্যটা। তাই যতই উয়েফা চাম্পিয়নস লিগ, ইউরোকাপে বিস্ময়কর প্রতিভার মাধুকরী নিদর্শন মেলে ধরুন না কেন, বিশ্বকাপে নিজের জাত চেনাতে না পারলে সব বৃথা। তাই এই বিশ্বকাপ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অগ্নিপরীক্ষা।

শব্দরূপ - ৫৫০

মন্দিরা পাল

১	■	২		৩	■	৪	■
	■		■	৫			■
৬			■		■		■
	■	■	■	■	৭		৮
৯	১০		■	■	■	■	
■		■	১১	■	১২		
■	১৩			■		■	
■		■	১৪			■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. অর্জুনের ধনু, আগাগোড়া আঠাযুক্ত গোলাকার ফলবিশেষ, ৫. খুব ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, ৬. প্রতিশব্দে ঢেউ, তরঙ্গ, ৭. পাপ, ৯. পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়, ১২. সমুদ্রমন্থনকালে মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহৃত পৌরাণিক পর্বত বিশেষ, ১৩. সুগ্রীব, বালী আসলে যে গোত্রের, ১৪. তৎসম শব্দে ব্রাহ্মণ বালক।

উপর-নীচ ঃ ১. দেবতার উদ্দেশ্যে সম্প্রদান করা, একে-তিনে জলাশয়, দুয়ে-পাঁচে হৃদয়, ২. দুর্যোধনের জননী, ৩. মুকুল, বোল, শেষ দুয়ে পশম, ৪. সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত জলপাত্রবিশেষ, ৮. সন্তান রক্ষাকারী দেবীর দয়া, ১০. পায়রার প্রজাতিবিশেষ, দুই-তিনে ইঙ্গ গোলাপ, ১১. শিবের রুদ্রমূর্তি, ১২. তৎসম শব্দে ব্যাঙ।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৪৮

■	শ	ং	ক	র	■	■	যা
পি	তা	■	■	বা	■	■	দ
■	নী	■	■	ব	সু	দে	ব
ম	ক	র	■	■	গ্রী	■	■
■	■	মে	■	■	ব	শি	ষ্ঠ
স	প্ত	শ	তী	■	■	ক্ষা	■
বি	■	■	ব	■	■	দা	নো
তা	■	■	র	বি	সু	তা	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৫০ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ জুন, ২০১০ সংখ্যায়

বিশ্ব দাবার 'হল অফ ফেমে' ভিসি আনন্দ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আর একবার বিশ্ব খেতাব জিতলেই গ্যারি কাসপারভকে ছুঁয়ে ফেলবেন বিশ্বনাথন আনন্দ। বুলগেরিয়ার চ্যালেঞ্জার ভ্যাসেলিন টেনিলিভকে তার দেশের মাটিতে ধরাশায়ী করে চতুর্থবার বিশ্ব খেতাব নিজের জিম্মায় রেখে ছিলেন 'ভিশি'। এই গ্রহে বর্তমানে 'ভিশিকে' চ্যালেঞ্জ জানাবার কেউ নেই। অন্য গ্রহেও আছে কিনা সন্দেহ। সুপার কমপিউটার তাকে বশ মানাতে পারে না, এমনই চিন্তা-বুদ্ধির উচ্চতম মহাযানে বসে আছেন তিনি। স্বদেশে তাকে নিয়ে অবশ্য তেমন হৈ চৈ হয় না। কারণ, সাধারণ মানুষ যে তার চিন্তা-চেতনার স্তরের সঙ্গে পরিচিত নয়। বিদেশে তার কদর ও গুরুত্ব দেখে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, অমর্ত্য সেনরাও ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। সলমন রুশদি তার গুণগ্রাহী হয়ে দাবা খেলতে বসে যান বন্ধুদের সঙ্গে।

ভারতবর্ষের সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ হিসেবে তিনি আসবেন ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, কে ডি বাবুর ঠিক পরেই। অনেকে আবার তাকে এক নম্বরে রাখতে চান, এদের ওপরে তুলে দিয়ে। কীর্তি গৌরবে ওই তিন অমর ভারত রত্নের সঙ্গে অবশ্যই একসঙ্গে বসার যোগ্য আনন্দ। তবে ভারতীয় হকির 'থ্রি-মাস্কেটিয়ার্স' শুধু একাধিক অলিম্পিক সোনাই এনে দেননি দেশকে, একইসঙ্গে ভারতীয়দের জাতিসত্ত্বারও উত্তরণ করেছেন। পরাধীন ভারতবাসীকে মাথা উঁচু করে চলার প্রেরণা দিয়েছেন আর স্বাধীন ভারতে দেশবাসীকে এক শক্তিশালী সমাজ গঠনে উজ্জীবিত করেছেন অলিম্পিক বিজয়মঞ্চে দাঁড়িয়ে। খেলা যে জীবন ও সমাজ গঠনের চালিকাশক্তি এ বোধটা সঞ্চারিত করেছেন ধ্যান, রূপ, বাবু অলিম্পিকে ভারতীয় হকির বিজয়রথ চালিয়ে নিয়ে গিয়ে।

শুধুমাত্র এই একটি কারণে 'ত্রয়ীকে' আগে রাখতে হবে আনন্দের। না হলে সমস্ত দিক বিচার করলে আনন্দ যে কাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছেন গত দু'দশক ধরে তার তুলনা তিনি নিজেই স্বয়ং। গ্যারি কাসপারভ যিনি পারতপক্ষে কোনও দাবাড়ুর প্রশংসা করেন না সচরাচর, তিনিও আনন্দের এবারের খেলায় মুগ্ধ হয়ে বলেই ফেলেছেন এই মুহূর্তে আনন্দই সর্বোত্তম গ্রাণ্ডমাস্টার। আর সৃজনীশক্তি ও উদ্ভাবনী দক্ষতার নিরীখে তার ও ববি ফিশারের সমতুল্য। বিশ্বের সর্বকালের চিন্তাশীল ও তাত্ত্বিক দাবাড়ুর মধ্যে আনন্দ থাকবেন উপরের সারিতে। এভাবে দ্বাদশ গেমে 'লাসকার ভ্যারিয়েশনে' বিভ্রান্ত করে অসামান্য সৃজনশীল দাবাড়ু টেনিলিভকে বিভ্রান্ত করে খেতাব দখলে রেখেছেন আনন্দ তা দেখে চমৎকৃত কাসপারভ।

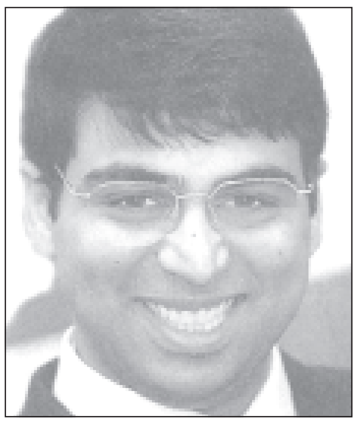

ভিসি আনন্দ

১৯৯১-এ ইতালির রেজিয়া মেলিয়াতে ১৮ ক্যাটাগরির গ্রা প্রি টুর্নামেন্ট জয় দিয়ে আনন্দের বিশ্বপরিক্রমা শুরু। তারপর একে একে জিতেছেন বিশ্বপর্যায়ের সব টুর্নামেন্ট। র‍্যাপিড, ক্লাসিক, টাইম— তিন ফরম্যাটেই বিশ্ব খেতাব জিতেছেন একাধিকবার। সিডনী অলিম্পিয়াডে (২০০০) দাবা ছিল প্রদর্শনী খেলা। সেখানেও অ্যালেক্সি সিরভকে হারিয়েছিলেন তিনি। বিল গেটসের সুপার কমপিউটার কাসপারভের মহড়া নিতে সক্ষম হলেও আনন্দের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের চারপ্রান্তে উপবিষ্ট চার সুপার গ্রান্ডমাস্টারের সঙ্গে খেলেছেন আনন্দ কয়েক বছর আগে। দুজনের বিরুদ্ধে জিতেছেন, ড্র আর হার একটি করে।

চন্দ্রাভিযান, মঙ্গলগ্রহ অভিযানসহ বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সব ঘটনার খবর রাখেন। পড়েন উন্নতমাত্রার ইংরাজি উপন্যাস। দেখেন 'ক্লাসিক' পর্যায়ের হলিউডি, ফরাসি ছবি। মাদ্রাজে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে যখন থাকেন অবসরে তখন দুনিয়ার প্রতিটি বিষয়ের খবর খুঁটিয়ে পড়েন খবরের কাগজে। যখন টুর্নামেন্টে থাকেন তখন টিভি ও ইন্টারনেট সার্ফিং করে সব দেখে নেন। সমস্ত কিছুর ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকেন বলেই তার মস্তিষ্ক ও মনন সব সময় সক্রিয় থাকে। যা তার খেলার সবকটি দিককেই আরো পরিশীলিত করেছে। নিত্য নতুন থিওরি ও স্ট্রাটেজি উদ্ভাবন করেন এর জোরেই। তবে তার স্ট্রাটেজিক পার্টনাররাও এরজন্য সমান কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, যার মধ্যে আছেন বাংলার সূর্যশেখরও।

আনন্দের সঙ্গে দুবছর 'সেকেন্ড' হিসেবে কাজ করেছেন সূর্যশেখর। পাশে পেয়েছেন আরও তিন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে। আনন্দের বিশ্ব চাম্পিয়ানশিপ শিরোপা জেতার পর বিশ্বজুড়ে তাকে নিয়ে যে আলোড়ন হচ্ছে তার সাক্ষী থেকে সূর্যশেখর কি শিখলেন। তার ওপর দেশবাসীর বিপুল প্রত্যাশা রয়েছে। দাবা অলিম্পিয়াডে অসাধারণ খেলেছেন। বিশ্বপর্যায়ের একটি টুর্নামেন্টে এই সেদিন চাম্পিয়ন হয়েছেন। আনন্দের উত্তরসূরী হিসেবে তিনি ও শশীকিরণই যে দাবিদার সে ব্যাপারে দুজনেই ওয়াকিবহাল। আর কয়েক বছরের মধ্যেই আনন্দ অবসর নেবেন। তখন তার সুমহান কীর্তি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার রক্ষার গুরুদায়িত্ব যে তাকেই তুলে নিতে হবে।

বিশ্বচাম্পিয়নশিপে আনন্দের সাহচর্য ও পরামর্শ আর বছরভর নানা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলে বেড়ানো সূর্যশেখর গাঙ্গুলির দিকে তাকিয়ে আছে দেশবাসী। গুরু-শিষ্যের পরস্পরের ওপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষের দাবার ভবিষ্যত।

যত ভাগ : তত ভোগ

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

অনেকদিন আগের কথা। বোধহয় ১৯৫৬-৫৭ সাল হবে। সে সময় বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি নিয়ে তুমুল রাজনৈতিক আলোড়ন চলছে। তখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ ভূমি-রাজস্ব বিভাগে কর্মরত ছিলাম।

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হতেন আশুতোষ মল্লিক। তিনি ছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার। তিনি তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যস্বত্তভোগীদের জমিদারি দখল আইন বাবদ প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের টাকার দরখাস্ত নিয়ে মন্ত্রী ও অফিসারদের ঘরে না গিয়ে সরাসরি ভূমি-রাজস্ব দপ্তরে হাজির হতেন এবং হাতে হাতে কাজ আদায় করে নিতেন। যতক্ষণ না তাঁর কার্যোদ্ধার হতো, ততক্ষণ তিনি বসে বসে নানা রসের গল্প ও পুরনো রাজনৈতিক ঘটনাবলী সালঙ্কারে বর্ণনা করে আমাদের আমোদিত করতেন। আমরা কনিষ্ঠ করণিকের দল তাঁর সেসব সরস ও সকৌতুক কাহিনী শুনতাম আর তাঁর কাজ করে দিতাম।

একদিন বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বা 'merger' (মার্জার) সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি হেসে বললেন—নেহাত শুনতে চাইছ, তাই বলছি।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তো একদিন আমাকে ডেকে বললেন—কি হে আশু, বঙ্গ-বিহার 'merger' সম্পর্কে তুমি তো কোনও উচ্চবাচ্য করছ না। ব্যাপার কি?

আশুবাবু—কি বলবো স্যার; কেউ কি নিজের পায়ে কুড়াল মারার কথা গলা ফাটিয়ে বলে?

ডাঃ রায়—মার্জারের প্রশ্নে পায়ে কুড়াল মারার কথা আসে কেন?

আশুবাবু—আপনি তো রোগীর মুখ দেখে রোগ নির্ণয় করেন স্যার; আমার মুখ দেখে কোথায় আমার ব্যথা তা কি বুঝতে পারেন না?

ডাঃ রায়—হেঁয়ালি রেখে ব্যাপারটা খুলে বলো তো।

আশুবাবু—যদি রাগ না করেন তা হলে খুলেই বলি। আপনি চাইছেন সংযুক্তি, আমি চাই বিযুক্তি। আপনি চান merger, আমি চাই division। কারণ—The more division, the more promotion —যত বিভাজন, তত প্রমোশন।

ডাঃ রায়—কি যা তা বলছ! মাথা খারাপ হয়েছে না কি?

আশুবাবু—যদি অভয় দেন তো বলি। আপনি আজ যে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে আছেন তা কিসের দৌলতে? মুসলিম লীগের মতিচ্ছন্ন হয়েছিল বলেই না? তারা যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে বাংলা ভাগ অনিবার্য করে না তুলতো, বাংলা অখণ্ড থাকত, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসত ফজলুল হক-সুরাবর্দী-নাজিমুদ্দীনরা। কোনও হিন্দু কোনওকালেই মুখ্যমন্ত্রীর গদির দখল পেত না। বাংলা ভাগ না হলে স্পীকারের আসনে বসত আলতাফ হোসেন। শৈল মুখার্জীও স্পীকার হতেন না, আমিও ডেপুটি স্পীকার হতাম না।

ডাঃ রায়—এসব পুরনো কথার দরকার কি? এখন বঙ্গ-বিহার মার্জার সম্পর্কে তোমার মতামত কি বল।

আশুবাবু—সে কথাই তো বলছি। বঙ্গ-বিহার মার্জার হলে আপনাকে চক্ষুলজ্জায় হয়তো একবার মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছাড়বে, তারপর আর কোনও বাঙালী মুখ্যমন্ত্রী হবে না। মুখ্যমন্ত্রী হবে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ কিংবা কর্পূরী ঠাকুর। আর স্পীকারের আসনে বসবে বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ। শৈল মুখার্জী হবেন ডেপুটি স্পীকার। ফলে আমার চাকরিটি নট হয়ে যাবে। তাই 'merger' সমর্থন করা আর জেনেশুনে বিষ পান করা একই কথা।

ডাঃ রায়—তোমার যত বিদঘুটে চিন্তাধারা। কবে কি হবে না হবে তাই নিয়ে উদ্ভট কল্পনা।

আশুবাবু—আপনি তো নীতিকথা নিশ্চয়ই জানেন স্যার : 'মার্জারস্য হি দোষেণ হতঃ বৃদ্ধঃ জরদগবঃ' 'অর্থাৎ মার্জারের (বিড়ালের) দোষে বৃদ্ধ জরদগব নিহত হয়েছিল। আর আপনার পরিকল্পিত এই 'merger'-এর ফল কি হবে জানেন? ফল হবে— 'Merger-স্য হি দোষেণ হত বৃদ্ধঃ আশুতোষঃ'—অর্থাৎ বঙ্গ-বিহার 'merger' হলে আমি বৃদ্ধ আশুতোষ মারা পড়ব; বৃদ্ধ বয়সে আমার চাকরিটি খোয়া যাবে। তাই কি আপনি চান?

ডাঃ রায়—তা হলে তুমি কি করতে বল?

আশুবাবু—আমার মতে The more division, the more promotion—যত ভাগ তত পদোন্নতি। আমি চাই পশ্চিমবঙ্গ আবার ভাগ হোক। বাঁকুড়া-বীরভূম-বর্ধমান-পুরুলিয়া জেলা নিয়ে ''পশ্চিম-পশ্চিমবঙ্গ'' নামে নতুন একটা রাজ্য গঠিত হোক। তাহলে একজন নতুন মুখ্যমন্ত্রীর পদ যেমন সৃষ্টি হবে, আমিও ডেপুটি স্পীকার থেকে স্পীকারপদে প্রমোশন পাব।

তারপরের কথা আর জানার দরকার নেই। তবে প্রয়াত আশুতোষ মল্লিক মশাই-এর দূরদর্শিতাকে স্বীকার করতেই হবে। আজ যে দিকে দিকে ছোট রাজ্য গড়ার দাবী উঠেছে, তা মল্লিক মশাইর 'The more division, the more promotion' ফর্মুলারই বাস্তব রূপদানের ভিত্তি বলে স্বীকার করতেই হবে। গোর্খাল্যাণ্ড, বোড়োল্যাণ্ড, কামতাপুরী রাজ্যের দাবী সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে না কি? অতীতে আসাম রাজ্য থেকে কেটে যে পাঁচটি রাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাও উপরোক্ত 'division : promotion' নীতিরই যে বাস্তবায়ন তা স্বীকার করতেই হবে। পাঁচজন মুখ্যমন্ত্রী, পাঁচটি বিধানসভা, পাঁচজন রাজ্যপাল এবং ৭০/৭৫ জন মন্ত্রীর হিল্লে তো হলো; সেরেস্তায় বাড়ল অজস্র কর্মচারী। ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সাম্প্রতিক পৃথক তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রের আন্দোলনও কি ওইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে না? এসব হাতির খোরাক জোগাবে কে? এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে যা বার্ষিক রাজস্ব আদায় হয়, তা দিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের কথা দূরে থাকুক, শাসনকার্য চালাতেই তহবিল শূন্য। ফলে কেন্দ্রিয় তহবিল থেকে অঢেল আর্থিক সাহায্যই একমাত্র-ভরসা। আর সেসব টাকার সদ্ব্যবহার? নৈব নৈব চ। তার সিংহভাগ মন্ত্রী-এম এল এ-আমলা ও দলীয় নেতাদের পকেটস্থ হয়। জনগণের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং।

দূরের কথা বাদ দিয়ে ঘরের কথা বলাই ভালো। বছর পনেরো আগে দার্জিলিং-এর সুভাষ ঘিসিং পৃথক গোর্খাল্যাণ্ড রাজ্যের দাবী নিয়ে তেড়েফুঁড়ে উঠল। বাঙালীদের দার্জিলিং ছাড়া করল। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বছরে শত শত কোটি টাকা দিয়ে তাকে শান্ত রাখা হলো। সে টাকায় সুভাষ ঘিসিং-এর দলবল নন্দোৎসব করল; আর গোর্খাদের আর্থিক অবস্থা যেমন ছিল, তেমন-ই রইল। উন্নয়নের কাজ শিকেয় তোলা রইল।

এখন আবার আঞ্চলিক অনুন্নয়নের ধুয়া তুলে বিমল গুরুং ফুড়ুং করে উঠল। তাকে শান্ত করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তেল মাখানোর শেষ নেই। বছর বছর যে শতসহস্র কোটি টাকা গোর্খা পরিষদকে উন্নয়ন খাতে দেওয়া হয়েছে সে টাকা কোথায় গেল, তাতে কি উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, সে হিসাব চাওয়ার হিম্মৎ কারও নেই। হিসাব চাইলেই স্বাধীনতার দাবী তোলা হবে। তার পেছনে তোল্লা দেবার শক্তির তো অভাব নেই। চীন, পাকিস্তান, ইসলামী ফাউণ্ডেশন ও খৃস্টান লবি তো দেদার হস্তে টাকা ছড়িয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত যোগাচ্ছে।

এবং সে অপচেষ্টা উদ্দেশ্য বিহীন নয়। যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সৃষ্টি হবে, সেগুলিকে গ্রাস করা তত সহজ হবে। বিচ্ছিন্নতার সম্প্রসারণ সহজতর হবে। 'The more division, the more promotion' শেষ পর্যন্ত 'the more secession'-এ পর্যবসিত হবে।

দেশগাঁয়ে কুকুরে-কুকুরে খাবার নিয়ে কামড়া-কামড়ি লাগলে, আশপাশের লোকজন বলত—জুদা খা, জুদা খা—অর্থাৎ আলাদা আলাদা খা, কামড়া-কামড়ি করিস না। চারদিকে ক্ষমতা ভোগদখল নিয়ে কাড়াকাড়ি, খেয়োখেয়িতে মানুষের মধ্যেও সেই কুকুর প্রবৃত্তির প্রকাশই যেন দেখতে পাই।

> **যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সৃষ্টি হবে, সেগুলিকে গ্রাস করা তত সহজ হবে। বিচ্ছিন্নতার সম্প্রসারণ সহজতর হবে। 'The more division, the more promotion' শেষ পর্যন্ত 'the more secession'-এ পর্যবসিত হবে।**

মার্কিন মুলুকে গুরুবন্দনা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১ মে হাউস্টনে অনুষ্ঠিত হলো চতুর্থ বার্ষিক গুরু-বন্দনা অনুষ্ঠান। হিন্দু এডুকেশন ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবীরা জনা-পঞ্চাশেক মাস্টার-মশাইকে গুরু-বন্দনার মধ্য দিয়ে সম্মানিত করেন। অনুষ্ঠানে আগত শিক্ষকদের স্বাগত জানানোর যাবতীয় বন্দোবস্ত ছাত্ররা করে রেখেছিল স্টেশন চত্বরেই। হিন্দু আনুষ্ঠানিকতার বিভিন্ন উপাদানে ভরা ছিল সেই স্টেশন চত্বর। নমস্কার করা, মন্দিরে বাদ্যধ্বনি—এহেন হিন্দু আনুষ্ঠানিকতার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ পোস্টার ছিল চোখে পড়ার মতো। হিন্দু সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রহ্লাদ আপ্পার পাওয়ার-পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। শিক্ষকেরা প্রায় প্রত্যেকই ছিলেন বিদেশী। অনুষ্ঠান দেখার পর তাঁরা স্বীকার করেই নেন—'এখানে এসে সত্যিই আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আমরা সবাই এক—এই জিনিসটা যে চমৎকারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে তাতে আমরা অভিভূত। আমরা সত্যিই এদিনের অনুষ্ঠানকে উপভোগ করেছি।'

প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুর অবদান যে অনস্বীকার্য তাই সকলের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। আর এতেই চমৎকৃত হয়ে পড়েন ওই বিদেশী শিক্ষকেরা। তাঁরা জানিয়েছেন যে এতদিন সেখানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ককে একটা ব্যাবসায়িক দৃষ্টিতেই দেখা হোত। আর্থিক লেনদেনের বাইরে এই সম্পর্কটা যে এতটা মধুর হতে পারে—অনুষ্ঠানের আগে তা ভাবতেই পারেননি তারা। তার ওপরে ছাত্রদের কাছ থেকে এমন উষ্ণ সম্মান আর অভ্যর্থনা পেয়ে বেজায় খুশিও হয়েছেন তাঁরা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কত্থক আর ভারতনাট্যম নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে তা দেখে আবেগ চেপে রাখতে পারেননি ক্রেব ইন্টারমিডিয়েটের কলা বিভাগের শিক্ষক দেব বিশপ। অপর শিক্ষক পেগ র‍্যাটক্লিফ জানিয়েছেন—'অর্জুন মহাভারতে গুরু দ্রোণের প্রশ্নের উত্তরে যে পাখির চোখের দিকেই তার একমাত্র লক্ষ্যের কথা বলেছিলেন তা আমাদের কর্তব্যনিষ্ঠাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।'

হিন্দু এডুকেশন ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা আমেরিকায় ভারতীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলছে। তাদের পক্ষ থেকে ওই অনুষ্ঠানে একটি শিক্ষা-প্রকল্প মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। যাতে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে যে ভ্রান্ত-ধারণা ইউরোপীয় জন-মানসে চালু রয়েছে তা নিরসনে হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বের আদর্শ তুলে ধরা হয়।

বলা বাহুল্য—গুরুরাই সেখানে অগ্রগণ্য!

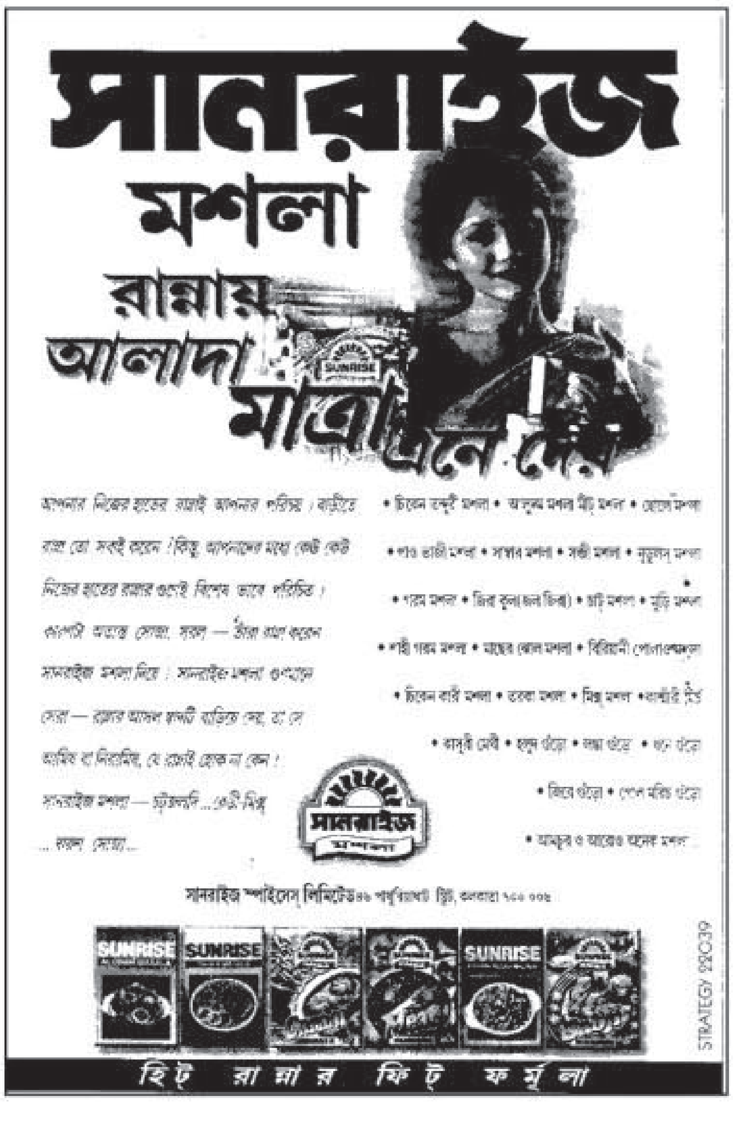

Swastika
7 June - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

মায়াপুরে সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষাবর্গ প্রারম্ভ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ২৮ মে শ্রীচৈতন্যদেবের পদধূলি ধন্য শ্রীধাম মায়াপুরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউটে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের সম্মিলিত দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের শুভারম্ভ হলো। ভারতমাতা, ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে বর্গের উদ্বোধন করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত ও নিবেদিত প্রাণ প্রাক্তন হাইস্কুল শিক্ষক প্রভু দেবকীনন্দন দাস অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস, বর্গের সর্বাধিকারী নগেন্দ্রনাথ গুছাইত এবং ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। দেবকীনন্দন দাস-অধিকারী তাঁর ভাষণে বলেন, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বলে গেছেন—'ভারতবর্ষকে পরম বৈভবশালী করা', সেই মহান উদ্দেশ্যপূর্তির জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সদাসর্বদা সক্রিয়। সেজন্যই এধরনের শিক্ষা-বর্গ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে গর্বিত ও ধন্য মনে করছেন'। বর্গের সাফল্য কামনা করে আশীর্বচন শেষ করেন।

বক্তব্য রাখছেন দেবকীনন্দন দাস অধিকারী।

বর্গের উদ্বোধনী ভাষণ দেন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সঙ্ঘ ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য হিন্দুসমাজকে সংগঠিত করার কাজ করে চলেছে। বিগত ৮৪ বছরে সঙ্ঘ একটা বিশেষ অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। এখন আর সঙ্ঘকে অবজ্ঞা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। হিন্দু সমাজও সঙ্ঘের আহ্বানে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান রক্ষার যাবতীয় আন্দোলনে সামিল। যদিও সঙ্ঘের নামে কিছু হয় না। সঙ্ঘ এবং হিন্দু সমাজ একাত্ম। এই রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞকে ব্যাহত করার জন্য দেশের শাসক কর্তৃপক্ষ তিনবার সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। প্রতিবারেই সঙ্ঘ স্বাভিমান ও সম্মানের সঙ্গে সেই বাধা অতিক্রম করে সকলের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশজুড়ে ২৮ হাজার স্থানে প্রায় চল্লিশ হাজার শাখার মাধ্যমে নিত্য প্রতিদিন এই কাজ চলছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত জানান প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। বর্গে দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত—বিভিন্ন স্থান থেকে ৭০ জন শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছেন।

বর্গের কার্যবাহ হিসেবে রয়েছেন সঙ্ঘের নবদ্বীপ বিভাগ কার্যবাহ জগন্নাথ সরকার, মুখ্যশিক্ষক দঃ ২৪ পরগণা বিভাগ প্রচারক শ্যামাচরণ রায়। সর্বব্যবস্থা প্রমুখ এই হাইস্কুলেরই শিক্ষক গৌতম পাল। উত্তরবঙ্গ থেকে ১৭ জন শিক্ষার্থী বর্গে এসেছেন।

স্থানীয় ইসকন্ মঠ কর্তৃপক্ষ বর্গে সর্বপ্রকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বর্গে পুরো সময় থাকবেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বর্গ পরিদর্শনে আসবেন বলে জানা গেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
শিক্ষাবর্গ - প্রথম বর্ষ
সভাপতি অলক কুমার মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রাখছেন।

তাঁতিবেড়িয়ায় সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সঙ্ঘশিক্ষাবর্গ সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "আমি হিন্দু। আমি সর্বত্রই নিজেকে হিন্দু বলেই পরিচয় দিই। হিন্দু পোষাক পরি। মাতৃভাষায় কথা বলে আনন্দিত হই। এখানেই আর এস এস-র চিন্তাধারার সঙ্গে আমার মনের মিল খুঁজে পাই। 'হিন্দু' বলা বা পরিচয় দেওয়াটা হীনমন্যতার দ্যোতক নয়।" এভাবেই হিন্দুত্ব সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করলেন প্রাক্তন বিচারপতি (জেলা ও দায়রা জজ) ডঃ অলক কুমার মুখোপাধ্যায়। হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরের মাঠে কুড়িদিন ব্যাপী সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের প্রকাশ্য সমারোপ অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। কৃতিত্বের সঙ্গে কর্মজীবন শেষ করার পর ডঃ মুখোপাধ্যায় সর্বত্র ধুতি-পাঞ্জাবীতে (ভারতীয় পোশাকেই) স্বচ্ছন্দ। পাড়া প্রতিবেশী সবাই তাঁকে সেভাবেই চেনেন। তবে, এদিনের অনুষ্ঠানে আসার পুরো কৃতিত্বটা তিনি দিলেন সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা ও সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। অনুষ্ঠানে আসার ব্যাপারে যোগাযোগটা করেছিলেন রথীনদাই। সব থেকে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে সঙ্ঘের শৃঙ্খলাবোধ। অনুষ্ঠান শুরুর পরই প্রায় পুরো সময় আকাশ কালো করে ঝড় ও বৃষ্টি। তাঁর মধ্যে অনুষ্ঠানে ছেদ পড়েনি। স্বয়ংসেবক এবং প্রবীণ বয়স্ক কার্যকর্তারা কেউই নিজের জায়গা ছেড়ে ওঠেননি। তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও নির্ধারিত অনুষ্ঠান সূচীতে কোনও এদিক-ওদিক হয়নি। মাঠে জল জমে গিয়েছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের—"শক-হুনদল পাঠান-মোগল একদেহে হলো লীন"-এটা কাব্যিক সত্য, বাস্তব সত্য নয়। শক-হুন-রা মিশে গেলেও অন্যরা মেশেনি। ডঃ মুখোপাধ্যায় এক্ষেত্রে পারসিকদের উদাহরণ সবার সামনে তুলে ধরে বলেন, পার্সীরা (পারস্য অধুনা ইরান) ভারতের আশ্রয় দানকারী রাজা যে যে শর্ত দিয়েছিলেন তা মেনে চলেছেন। দুধে চিনি মেশানোর মতো মিশে গিয়েছেন। নিজেদের জরথুষ্ট্রপন্থী ও অগ্নি উপাসক হিসেবেই এদেশে থেকে গেছেন। ভারতের উন্নয়নে হাত লাগিয়েছেন।

এদিন সভার প্রথমপর্বে শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকরা ব্যায়ামযোগ, সূর্যনমস্কার, যোগাসন, ঘোষ (Band), নিযুদ্ধ ও দণ্ডের বিভিন্ন শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শন করেন। প্রাস্তাবিক ভাষণে সঙ্ঘের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ দিলীপ আঢ্য। বর্গাধিকারী সুশীল রায় বর্গের প্রতিবেদন পেশ করে জানান ১৩০ স্থান থেকে ১৮৬ জন স্বয়ংসেবক শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দিয়েছেন। এদিন সভায় জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে নিহত ব্যক্তিদের জন্য সঙ্ঘের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষেই আকাশ শান্ত হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বর্গের ব্যবস্থা প্রমুখ তাপস ভট্টাচার্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাদল মহারাজ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করছেন। পাশে প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার ও বর্গাধিকারী বাসুদেব ঘোষ।

ফরাক্কায় বিশেষ প্রথমবর্ষ সঙ্ঘশিক্ষাবর্গ

তরুণকুমার পণ্ডিত।। গত ২৩ মে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র ও অসম ক্ষেত্রের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ (বিশেষ)-এর উদ্বোধন হয়ে গেল মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা হিন্দু মিলন মন্দিরে। গঙ্গার ধারে গাছপালা ঘেরা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দির সংলগ্ন মনোরম পরিবেশে ও কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে বর্গের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী বাদল মহারাজ। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ প্রবীর মিত্র। উদ্বোধনী ভাষণে বয়স্করাও যে সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রীয় সঙ্কটের আহ্বানে এইরূপ বর্গে আসতে পারেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। হিন্দুত্বের আদর্শে কষ্টের মধ্যে দিয়ে আমরা শুদ্ধ সাত্ত্বিক পরিবেশে যে শিক্ষা গ্রহণ করব তা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে বলে তিনি বলেন। উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্ত, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ বিদ্রোহী সরকার, পূর্বক্ষেত্রসহ-শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল। ২০ দিনের এই বর্গে বর্গাধিকারী রূপে আছেন বাসুদেব ঘোষ, বর্গ কার্যবাহ রাজু কর্মকার, পালক অধিকারী নারায়ণ চন্দ্র পাল, মুখ্য শিক্ষক জয়রাম মণ্ডল ও বৌদ্ধিক প্রমুখ হিসাবে আছেন সুজিত সামন্ত। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে দু'জন, ত্রিপুরা থেকে ১ জন, অসম থেকে ১ জন, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ থেকে ২৩ জন, মোট ২৭ জন বর্গে শিক্ষার্থী রয়েছেন। ৪৫ বছর থেকে ৭৪ বছর পর্যন্ত বয়স্ক স্বয়ংসেবকরাই এই বিশেষ প্রথম বর্ষ বর্গে উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্র সেবার জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

প্রকাশিত হবে
৫ জুলাই '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে
৫ জুলাই '১০
তথ্যসমৃদ্ধ ও মননশীল বিভিন্ন রচনা নিয়ে এবারের
শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা
হিন্দুত্বের প্রহরী
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ ছয় টাকা।।
১৯ জুনের মধ্যে কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম এর ......
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com